অনুপম দিন

সৈয়দ শামসুল হক

সূচিপত্র

১. প্রথমে দেখেছিল বীথি.....2

২. হাশেম জ্বরে কাঁপছে.....22

৩. ডাক্তার এসে চলে গেছে.....46

৪. বারান্দায় এসে হাশেমের মুখোমুখি.....77

৫. খাবার সাজাতে সাজাতে আমেনা.....99

৬. পাখাটা ছেড়ে দিয়ে বিলকিস বলল.....118

৭. আবু সেই যে দুপুরে.....140

৮. বিলকিস ভেতরে এলে.....158

১. প্রথমে দেখেছিল বীথি

প্রথমে দেখেছিল বীথি। দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল। লোকটা কী রক্তিম চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন অন্তর পর্যন্ত তার দৃষ্টির কিরণ এসে বিঁধছে। তখন দুপুর বেলা। মাথার পরে খাড়া রোদ। শরীর খারাপ বলে আজ আর কলেজে যায় নি বীথি। অবশ্যি শরীরটা যে তার সত্যি সত্যি খারাপ ছিল, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ, কলেজের গাড়ি আসার একটু আগেও তাকে দেখা গছে কলেজে যাবার উদ্যোগ করতে। তারপর হঠাৎ কী হলো কে জানে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঘরে এসে দেখেছিল, আবু তার খাতায় লিখে গেছে—- আমার নাটক দেখতে তুই না এলি তো বয়েই গেল। আমি কি তোর জন্যে নাটক করছি? যা কলেজে, গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাক বইয়ের ওপর।

আবু ইউনিভার্সিটিতে নাটক করছে। বীথিকে যেতে বলেছিল রিহার্সেলে। লজ্জা করেছে বীথির। মাথা নেড়ে বলেছিল, না। সেটা শুনে দুমদুম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে আবু। তারপর এই চিঠি। তাতেও কিছু হতো না। বই নিয়ে খোটা দেয়ায় ভীষণ অস্বস্তি হলো তার। চাচিমাকে গিয়ে বলল, গাড়ি এলে ফেরত পাঠিয়ে দিও। আজ যাবো না।

চাচিমার কাছে আজ আড়াই বছর আছে বীথি। এই আড়াইটে বছরে এই ছায়া-ছায়া, কম কথা বলা, মায়া পরানো মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবেসে ফেলেছেন। হাতের রান্না ফেলে তিনি বললেন, কেন?

তাঁর উদ্বিগ্ন স্বর শুনে সংকুচিত হলো বীথি। যেন কিছু না, তাই সাহস দেয়ার জন্যে হেসে উত্তর করল, ভালো লাগছে না।

কী রে?

শরীরটা।

চাচিমা এক পলক তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। কী বুঝলেন, বললেন, তবে থাকগে, তোর কলেজে গিয়ে কাজ নেই।

তখন পরম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বীথি গিয়ে ডুবেছে নিজের ঘরে।

খাতার যে পাতায় আবু লিখেছিল সেটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত হলো সে। তারপর দুপুরে চাচিমার সংগে খেতে বসেছে বীথি। মরিয়মের কাছে তার মনের দরোজাটা ছিল ভীষণ রকমে খোলা। একবার ভেবেছিল, আবুর কথা বলবে। ঠিক তখন বাধা পড়ল। মরিয়ম বললেন, আচ্ছা বীথি, তুই যে রান্নাবান্না কিছু শিখলিনে, তোর বাবা আমাকে কী বলবে বলতো।

কেন? কী আবার বলবে?

বিয়ে হলে কী করবি? বেঁধে খাওয়াতে হবে না?

বীথি হঠাৎ তার পাতের দিকে মনোযোগ নাবিয়ে এনে প্রসঙ্গটা বদলাতে চায়। বলে, তুমি কিন্তু সব আমাকে দিয়ে দিচ্ছ, চাচি মা। এইটে নাও, এইটে নাও, আমি আর কিছু নিচ্ছি নে। বীথি বাটি উপুড় করে ঢেলে দেয় মরিয়মকে। কিন্তু তাঁর যেন তখন ঘোর লেগেছে। বীথির দিকে মায়া চোখে তাকিয়ে তিনি বলে চললেন, ছুটির দিনে তুই আমার সংগে রান্না করবি। রান্না না করলে কাছে বসে থাকবি। নইলে তোর বাবার কাছে নালিশ করে দেব।

দিও, যতো পার দিও তুমি।

খাবার ঘরের বাইরে নিম গাছটায় তখন খুশির রোদে ঝিলিমিলি লেগেছে। বীথির মনোযোগ তখন সেদিকে।

এমনি ছিল দুপুরটা।

দুপরে শুয়ে শুয়ে বই পড়া চলছিল বীথির। পানির তেষ্টা পাওয়াতে নেবে এসেছিল রান্নাঘরে। সারাটা বাড়ি তখন কেমন ঘুম ঘুম করছে। চাচা গেছেন অফিসে। চাচিমা শুয়ে

আছেন পাখা ছেড়ে দিয়ে। নিম গাছটা নিথর হয়ে আছে। রান্নাঘর থেকে কী মনে করে বসবার ঘরের বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসতে গিয়েছিল বীথি। সেই তখন।

দেখে, একটা মানুষ, একমাথা রুখু চুল তার, চোখের কোলে কালিমা, কেমন চেনা চেনা—-সোফার ওপর দুপা তুলে নিবিষ্ট মনে কাগজ পড়ছে। বুকের ভেতরটা এক মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেল বীথির। লোকটা তার পদশব্দে কাগজ সরিয়ে বীথির দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন তাকে তন্ময় থেকে ফিরিয়ে এনে ভারী অন্যায় করেছে সে।

বিব্রত হয়ে চলে যাচ্ছিল কী যাবে, তখন লোকটা বুকের কাছে হাঁটুজোড়া আরো নিবিড় করে টেনে এনে বিড়বিড় করে বলল, আমাকে একটু পানি দিতে পারো?

যেন এক জীবনের বিনিময়ে পানি চাইছে লোকটা।

মরিয়ম আলুথালু বেশে ছুটে এসে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলেন হাশেমকে। বললেন, বাবা, তুই এতদিন কোথায় ছিলি? এতদিন পর মায়ের কথা মনে পড়লো সোনা আমার। তার পেছনে পানির গেলাশ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বীথি। পাঁচ বছর পর বাড়ির বড় ছেলে এমন করে ফিরে আসবে, আজ সকালেও তা কে ভেবেছিল? হাশেমকে অনেক ছোটকালে দেখেছিল বীথি। সে দেখার সংগে কোন মিল নেই লোকটার। যেন একটা রাস্তার মানুষ উটকো এসে হাজির হয়েছে। বীথির বুকের মধ্যে কেমন দুপদুপ করতে থাকে, খানিকটা ভয়ে, অনেকখানি আনন্দে।

হাশেম কিন্তু মায়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে এলোপাথারি হাত প ছুঁড়ছে। মুখে বলছে, আহা ছাড়ে। ছাড়ো না। কী শুরু করেছ?

তখন শান্ত হলেন মরিয়ম। তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ছাড়বোই তো বাবা। ছেড়ে তো দিয়েই ছিলাম। আবার তবে জ্বালাতে এলি কেন?

মরিয়মের কণ্ঠে কান্না আসতে চাইছে। সেটাকে তিনি আঁচলের মধ্যে লুকোলেন।

হাশেম তখন খুব আস্তে উচ্চারণ করল, হাসল, তোমাকে জ্বালিয়ে সুখ আছে, মা। তুমি জ্বলবে, কিন্তু কিছু বলবে না। আর আমি? জ্বলে যাচ্ছি, চীৎকার করছি।

বলতে বলতে হাশেম ঝটকা মেরে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। যেন একটা দীর্ঘ সৌন্দর্য রেখার জন্ম হলো হঠাৎ। যেন পা থেকে মাথা অবধি একটা শেকল বাধা শক্তি মুক্তি পেয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়াল। গাঢ় বেগুনি রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ময়লা পাজামা, স্যান্ডেল। তবু মনে হলো রাজার পোশাক পরে দরবারে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে হাশেম। দ্রুত বারকয়েক পায়চারি করল সে। মরিয়মকে উপেক্ষা করে, বীথির দিকে না তাকিয়ে, তাদের সমুখে থেকেও যেন অনেক দূরে দাঁড়িয়ে, খানিক হাঁটল হাশেম। একবার দাঁড়িয়ে পেছনে হাত বেঁধে মাটির দিকে চোখ রেখে কী ভাবল। তারপর আবার এক সর্বস্ব ধরে টান দেয়া অস্থিরতার তাড়ায় ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল, তোমাকে জ্বালিয়ে সুখ আছে, মা। পাঁচ বছর আগে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল—- বুকের আগুন দিয়ে বিশ্বসংসারকে জ্বালিয়ে মারব। ঠিক

এইখানটায়, দ্যাখো মা–মরিয়মের সামনে এসে হাত দিয়ে নিজের হৃদয়টাকে ইঙ্গিত করে হাশেম। বলে, সারাক্ষণ একটা আগুন। জ্বলছিলো। মস্ত বড় আগুন। মনে করেছিলাম, সব কিছু পুড়িয়ে মারব এ আগুনে। কিন্তু পারলাম কই, মা? হাজার হাজার মানুষ দেখলাম। তারা সবাই কী বলল, জানো? বললো, সাধু বাবা, বুকের ভেতরে আগুন জ্বলছে, তাকে নিভিয়ে দিতে পারো? হাজার হাজার মানুষ। আমার পা ধরে যখন কাঁদত, বলতাম—- ভাগ, পালা এখান থেকে। তবু কি ছাড়ে ওরা? ইস, একেকটা মানুষ ভেতরে ভেতরে, শরীরে চামড়া–মাংসের দেয়ালের ওপারে, দোজখ থেকে সব লকলকে আগুন নিয়ে এসেছে। আমি তার কী করব? একজনকে পা টেনে লাথি মারতে গিছলাম, পা উঠলো না।

বীথি দেখছিল মরিয়মকে। পাঁচ বছর পর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি। বোবা চোখ দিয়ে অসহায়ের মতো ছেলেকে অনুসরণ করে চলছেন। যাবার সময় লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তবে কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে হাশেম? হাশেম কথা বলতে বলতে চলতে চলতে কখন বীথির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা টের পেয়ে বীথি চঞ্চল হয়ে উঠল। তার হাত থেকে গেলাশ নিয়ে সবটা পানি ঢকঢক করে খেয়ে শুধাল, এই মেয়েটি কে মা?

ছেলের হাত থেকে শূন্য গেলাশ ফিরিয়ে নিয়ে মরিয়ম বললেন, বীথি—- তোর ছোট চাচার বড় মেয়ে। তুই যাবার পর এখানে এসেছে।

তাই হবে। অনেক ছোট দেখেছিলাম।

বলতে বলতে হাশেম আবার গিয়ে বসল সোফায়। তার মুখ থেকে নিজের কথা শুনে বীথির কেমন সংকোচ হলো। চলে যাবার উদ্যোগ করল চাচিমার হাত থেকে গেলাশ নিয়ে, তখন পেছন থেকে ডাকল হাশেম।

এই শোনো।

বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর বীথির পা জোড়া অবশ করে দিয়ে গেল যেন।

শোনো এদিকে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বীথি এসে দাঁড়াল তার সমুখে। হাশেম হাত বাড়িয়ে তার সুদীর্ঘ বাম বাহু দিয়ে স্পর্শ করল ওর কাঁধ। সঞ্চারিত করল শক্তি। আস্তে আস্তে সে মেয়েটাকে বসিয়ে দিল মেঝের ওপর, পায়ের কাছে। বীথি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বিচলিত বোধ করলেন মরিয়ম। এগিয়ে এসে বললেন, কেন, বীথিকে চিনতে পারছিস না তুই?

আমি ওর চোখ দেখছি, মা। আমি ওর চোখ দেখছি। আমি ওর চোখ দেখছি।

মন্ত্রের মতো বিড়বিড় করে বলতে থাকে হাশেম। তারপর হঠাৎ কাঁধ থেকে হাত টেনে নিয়ে আচমকা বলে, এত কষ্ট পাস কেন, বীথি?

কী ছিলো তার কণ্ঠে, কথা শুনে বীথির চোখ সজল হয়ে উঠতে চাইলো। কিছু বলতে পারল না। তখন জোর করে মাথা নাড়ল। মাথা নাড়তে গিয়ে সারা গা কেঁপে উঠল থরথর করে, যেন তার সব আবরণ খসে খসে পড়ছে।

ভীত হলেন মরিয়ম। বললেন, ওকে ঘাবড়ে দিয়ে আনন্দ হচ্ছে তোর?

তার ছেলে যে সত্যি পাগল হয়ে গেছে, এইটে মনে করে কান্না পেল তাঁর।

বীথির দিকে চোখ রেখেই হাশেম মাকে বলল, ঘাবড়ে দেব কেন মা? যা সত্যি তাকে কবর দিয়ে রাখলে বিশ্রী একটা অসুখ হয়। সে অসুখ থেকে মুক্তি মৃত্যুর পরেও আসে না, জানো না তুমি? কিরে বীথি, কী হয়েছে? কষ্ট পাস কেন?

বীথি মৃদুকণ্ঠে বলতে চায়, কই, নাতো।

কিন্তু শোনা যায় না।

হাশেম পা দুটোকে আবার গুটিয়ে আনে বুকের কাছে। চেপে ধরে নিবিড় করে দুহাতের বেষ্টনীতে। এই কবছরে এই মুদ্রাদোষটা দাঁড়িয়ে গেছে ওর। বলে, মানব জন্মের দোষই

ওই, বুঝলি? শুধু কষ্ট পাবে। বুঝতে পারবে, অথচ কিছু করতে পারবে না। শোন, ভাল মন্দ বুঝতে পারিস? কোনটা আলো আর কোনটা অন্ধকার? নাহ, তোকে অনেক শেখাতে হবে, নইলে বেঁচে থাকবি কী করে? বেঁচে থাকার জন্যে বই পড়, এঞ্জিন বানানো, দালান গড়াই যদি যথেষ্ট হতো তাহলে মানুষ কাঁদতেই জানত না। ভালোই হলো, এখানে এসে আমাকে আর বসে থাকতে হবে না। তোকে নিয়ে একটা কাজ পাওয়া গেল। যাঃ পালা শীগগীর।

বীথি উঠে দাঁড়ায়। এক মুহূর্তে কে যেন তাকে ভীষণ রকমে দুর্বল করে দিয়ে গেছে। হাশেম বলল, হ্যাঁ শোন, আমাকে একটা কম্বল দিতে পারিস? জ্বরটা খুব জেঁকে আসছে রে।

.

তিন ছেলে মরিয়ম আর মুরশেদ চৌধুরীর। একেবারে ছোট আবু, এবার এম এ পাট টু–তে পড়ছে। মেজ মাহবুব, চাকুরি করে, বিয়ে করে বউ নিয়ে থাকে গেণ্ডারিয়ায়। আর সবার বড় হাশেম পাঁচ বছর আগে এম এ পড়তে পড়তে পরীক্ষা দিল না।

তখন জিজ্ঞেস করলে খুব একটা অন্যমনস্ক গলায় উত্তর করত, পড়ে কী হবে? পড়ে কিছু হয়?

এটা উত্তর হলো না; কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলত না হাশেম। বাবা শাসন করলেন, মা কাঁদলেন, বড় চাচা এসে বোঝালেন একদিন। কিসসু হলো না তাতে।

তখন ভীষণ চুপচাপ থাকত হাশেম। সারাটা দিন বসে বসে কী ভাবত তার হদিস কেউ পেতো না। একেকদিন দেখা যেত বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দরাজ গলায় কবিতা আবৃত্তি করছে। কিংবা বাগানে একটা গাছ পছন্দ হয়ে গেছে, তার গোড়ায় পানি ঢালার অত্যাচারে সেটা যদ্দিন না মরছে, যেন নিস্তার নেই। মরে গেলে মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরুতো, যাহ।

হঠাৎ একদিন এ সব গেল থেমে। শুরু হলো বই পড়ার নেশা আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ছিঁড়ে ফেলা। সে লেখা দেখাতে না কাউকে। যক্ষের মতো কুটি কুটি কাগজ আগলে বসে থাকত, তারপর বাগানে বসে আগুন জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে শান্তি।

একদিন ভাটা পড়ল এতেও। তখন দুতিন দিন এক নাগাড়ে খোঁজ পাওয়া যেত না হাশেমের। দুদিন তিনদিন পরে যখন এসে হাজির হতো, তখন গা মাথা ধুলোয় ভর্তি, চোখ জবাফুলের মতো লাল। কাউকে কিছু না বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত। খেতে বললে সময় মতো খেতে আসত না। দুপুরের রান্না বাসি হয়ে যেত, রাতের দুধ বেড়ালে খেতো। অনাহারে কাটত একদিন দুদিন। আবার একেকদিন সাত রাজ্যের খিদে যেন পেয়ে বসত তাকে।

মরিয়ম একদিন রাতে তার খাটের ওপরে উঠে এসে কপালে হাত রেখে বললেন, বাবা, তুই কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবি?

কে? মা? আহ্ কাঁদছ কেন?

তোর কী হয়েছে আমাকে বলতে পারিস না?

তখন হাশেম চোখ বুজে অন্ধকারে মাকে, মার মুখ অস্থির আঙ্গুলে অনুভব করতে করতে বলল, তুমি বুঝবে না, মা।

তারপর নিজের ওপরে নিজেই যেন চটে উঠল হাশেম। আধো উঠে বসে প্রায় চিৎকার করে বলল, ছাই আমি নিজেও কী বুঝতে পারছি? মনে হয় আকাশ থেকে বজ্র এনে দিই সব ঠাণ্ডা করে। যাক যাক—- সাধের পৃথিবীটা চুলোয় যাক। আমার কী?

মরিয়ম ছেলের কথা একবর্ণ বুঝতে পারেন না। বলেন, ও–কী বলছিস তুই হাশেম? আমার বুকের ভেতরটা যে কেমন করছে।

তখন লাফ দিয়ে হাঁটুর ওপর উঠে বসেছে হাশেম।

আমাকে তুমি খুন করতে পারবে, মা?

শুনে মরিয়ম পাথর হয়ে গেলেন। হাশেম বলে চলল, উহ, পৃথিবীতে এত অসঙ্গতি একবার তুমি যদি জানতে পারতে, মা। একবার যদি জানতে পারতে, এক মুহূর্ত তোমার বাঁচতে ইচ্ছা করত না। গলায় দড়ি দিতে।

সে রাতেই মরিয়ম স্বামীকে বললেন, ওগো দ্যাখোনা ছেলেটার কী হয়েছে। মনে মনে মুরশেদ চৌধুরীও কম ভুগছিলেন না। প্রসঙ্গ উত্থাপনে এতদিনকার জমানো ক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

কী আবার হবে? ঢের বাঁদর ছেলে দেখেছি আমি।

মরিয়ম কান্নাভরা গলায় বললেন, তুমি একটা নিষ্ঠুর, বুঝলে? ছেলে আমার পাগল হয়ে যাচ্ছে, তুমি বাপ হয়ে চুপ করে আছো?

পাগলই তো। নইলে অমন ব্রিলিয়ান্ট ছেলে হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, শুনেছ কখনো? পরদিন সকালে উঠে হাশেমকে পাওয়া গেল না।

.

আড়াই বছর আগে বীথির বাবা যখন মেয়েকে মেজভাই মুরশেদের কাছে রেখে গেলেন ঢাকায় কলেজে পড়বে বলে, মরিয়ম ততদিনে শোকের বরফে পাথর হয়ে গেছেন। হঠাৎ করে যেন বুড়িয়ে গেছেন তিনি। আত্মযত্নের দিকে কোনো লক্ষ্য নেই, সংসারের

ভালোমন্দে চিরউদাসীন। এমন করে দিন চলে না। মুরশেদ চৌধুরী কম বোঝান নি। বড় জা আমেনা এসে কম সান্ত্বনা দেন নি। কিন্তু মরিয়মের যেন মৃত্যু হয়ে গেছে।

চাচিমাকে দেখে চমকে উঠেছিল বীথি। এর আগেও কি সে তাঁকে দেখেনি? দেখেছে। তখন কত উজ্জ্বল, মধুর হাসিতে মুখরিতা ছিলেন মরিয়ম। এখন সেই একই মানুষকে দেখে মনের মধ্যে বিষম একটা ধাক্কা পেয়েছিল বীথি। আর অন্যদিকে চাচা। সেই সদালাপী সদাহাস্য চিরউদার মানুষটিও যেন হঠাৎ করে পাথরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। বড় চাচা খোরশেদ চৌধুরী নিঃসন্তান মানুষ। ঢাকাতেই থাকেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, বীথি আমার কাছে থাক।

কিন্তু মরিয়মের জন্যে সেটা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেছিলেন, না, বীথি থাকবে তার কাছে। বীথিরও মনের টান ছিল মরিয়মের জন্যে।

প্রথম দিনই কোলের কাছে বসিয়ে মরিয়ম বীথিকে বলেছিলেন, আমার কী ভাগ্য দেখ, মা। নিজের ছেলে হারিয়ে মেয়েকে কাছে পেলাম। হারে বীথি, তুইও পালাবি নাকি?

বীথির তখন কতই বা বয়স। কিন্তু বুকের ব্যথা বোঝার মতো অন্তর ততদিনে তার তৈরি হয়ে গেছে। সে বলেছে, তুমি আমাকে পর মনে করো, চাচিমা?

মরিয়ম বুঝতে পারেন কথাটা গিয়ে কোথায় লেগেছে। লজ্জিত হন। তার চিবুক নেড়ে বলেন, নারে না। আমার কথা ধরতে নেই। হাশেম চলে গেছে থেকে কী বলতে কী বলি। তুই পর হতে যাবি কেন?

বীথি বলেছে, আমি কিছু মনে করিনি, চাচিমা। আমাকে নিয়ে তুমি ভেবো না। এতদিন তোমার দেখবার কেউ ছিল না, আজ থেকে আমি হলাম।

মরিয়ম বলেছেন, বোস ভালো করে। তোর চুল আঁচড়ে দি। একেবারে জট করে ফেলেছিস পাগলি।

ঘরে হাশেমের একটা বড় ছবি বাঁধানো ছিল। বীথির মন তখন কৌতূহলী হয়ে সেই ছবিটা দেখছে। যে লোকটা তার চাচিমার এত কষ্টের কারণ ছবির মধ্যে তার মন খুঁজে মরছে সেই কারণটা। বলেছে, আচ্ছা চাচিমা, হাশেম ভাই চলে গেলেন কেন?

বড়ো সরাসরি শুধিয়ে ফেলেছিল বীথি। শুনে মরিয়ম তার মুখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে রইলেন খানিক। পরে বললেন, কী জানিরে। বোধহয় ও আমার কোলে বনের পাখি ছিল। একদিন তাই কাঁদিয়ে যেতে এতটুকু বাধলো না।

পরে আস্তে আস্তে শুনছে বীথি—- কিছুটা আবুর কাছ থেকে, কিছুটা মাহবুব ভাইয়ের কাছ থেকে। কিন্তু তা থেকে কতটুকুইবা বোঝা যায়? আর দেয়ালে ঝোলানো ওই

ছবিটা। ছবির ভেতরে যেন সাংকেতিক ভাষায় সব কিছু লেখা আছে। দুরাশায় কত কতদিন বীথি তার ছবিটাকে গভীর চোখে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখেছে।

একদিন কতগুলো চিঠি খুঁজে পেয়েছিল বীথি। হাশেমের ফেলে যাওয়া বাক্সের একেবারে তলায়, এককোণে পড়ে ছিল। ভেতরটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে এই কাণ্ড। খামগুলোর ওপর মেয়েরি হাতে সুন্দর করে লেখা হাশেমের নাম লুকিয়ে চিঠিগুলো পড়েছিল বীথি। কাছে রাখতে সাহস হয়নি। আবার রেখে দিয়ে এসেছে নিরুদ্দিষ্ট মানুষটার বাক্সে।

হাশেমের একটা অজানা অধ্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেদিন তার কাছে। কে এই মেয়েটা যার নাম বকুল?—- যে চিঠি লিখত হাশেমকে, যার চিঠি জমিয়ে রাখত হাশেম—- যার জন্যে এত কষ্ট?

প্রথম চিঠিটা ছিল এমনি

হাশেম সাহেব,
অনেকদিন পরে যেন একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ দেখলাম। বিচার, বিশ্লেষণ, মাপা সেঁকা, অনেক হলো। অনেক বাচাল মানুষের সাক্ষাৎ মিলল। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হলো, আপনার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও হৈচৈ করে, ঢোল বাজিয়ে তা রাষ্ট্র করতে রাজি নন। আপনি যে পরিচ্ছন্ন, নির্মল, সেজন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। নির্মলতার পরিচ্ছন্নতার দুএকটি বিরল বিন্দুর দেখা না পেলে যে আত্মায় পচন ধরবে এতে আশ্চর্য কী! কিন্তু

আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আত্মাকে আমি পচতে দেব না। আপনি মরে যান, তবু ভালো আপনার মনের সৌন্দর্য যেন না মরে এই কামনা করি। এটা দেখবেন আমার হয়ে, যারা এ পর্যন্ত সৌন্দর্যের পূজো। করেছে, মৃত ও জীবিত, তাদের হয়ে।
ইতি—- বকুল

কথাগুলো ভালো করে বুঝতে পারে নি বীথি। কম্পিত হাতে আরেকটা চিঠি সে খুলেছে।

কে বলেছে আমার হৃদয় প্রদীপের মতো? লোহা বলতে পারেন। আমাকে ডাকা মানে কষ্ট পাওয়া। আমার সান্নিধ্য খোজা মানে অভিশাপ ডেকে আনা। বন্ধুত্বের চেয়ে বড় কিছু চাইবার নেই পৃথিবীতে। কিন্তু সে পথেও যদি নিয়তি অমঙ্গল বিছিয়ে রাখে তো তা থেকেও বিমুখ হতে হবে।

চিঠি পড়ে বীথি বুঝতে পারে না, একটু একটু মনে হয়, বকুলকে কি নিজের হৃদয়ের কাছে ডেকেছিল হাশেম ভাই? কিন্তু কেন বকুল পারছে না তার ডাকে সাড়া দিতে? বকুল কেন ফিরিয়ে দিচ্ছে হাশেমকে, এ কথা কোনদিন জানবে না বীথি।

পরের চিঠিটা কিন্তু আবার অন্যরকম। একেবারে নতুন কণ্ঠ নিয়ে বকুল কথা বলছে এই চিঠিতে।

আপনার অস্থিরতার জন্যেই বোধ হয় আপনাকে চেনা মনে হলো। আমার আবেগ গিয়ে এখন আছে স্থিরতা; অভাবনীয়তা গিয়ে এখন আছে অত্যন্ত আটপৌরে এক মন। এটা

ছিল অনিবার্য। আমার রক্তের ভেতরে যেন বৈরাগ্য বাসা করে নিয়েছে। মানুষের মিছিলে আমার প্রিয়জন গেছে হারিয়ে আর আমি সমানে এগিয়ে চলেছি. দূরত্ব বৃদ্ধি করার দুরাশায়। আমি অদ্ভুতভাবে বিজ্ঞ। একটা অস্তিত্ব খায় দায় কথা বলে, আরেকটি সারাক্ষণ উদাস চোখ মেলে বসে থাকে। আমাকে কি সহ্য হবে?

কী হয়েছিল কে জানে, পরের চিঠিটায় বীথি দেখল, বকুল চটে গেছে। দুঃখ করেছে। দুঃখ পেয়েছে। নইলে অমন করে লিখতে যাবে কেন?

বলেছি ডাকবেন না। তাকে ভুল বুঝলেন কেন? মানুষকে যে অবিশ্বাস করে তার জন্যে নরকের দুয়ার সারাক্ষণ হাঁ করে আছে এই সত্য থেকে আমি মুক্তি খুঁজছিলাম। কিন্তু তার একমাত্র উপায় বোধ হয় মায়ার ভেতরে আশ্রয় নেয়া। অথচ কোনো মায়ার বন্ধনে পরাই এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভেতরের একাকীত্ব কি কেউ ঘোচাতে পারে কখনো? আজ আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে, আমার জীবন আর ফিরে আসবে না। রক্তহীন আত্মা, মরা ঘাসের রং আর ধূসর গুমোট আকাশ ছাড়া আর কিছুরই নাগাল যেন আমি পাবো না। তাই আবার আপনাকে সাবধান করছি আমি আমাকে ডাকবেন না, ডেকে পাবেন না।

এর পরের চিঠি লেখা অনেকদিন পরের তারিখে।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজ কলম হাতে নিতে পেরেছি। এমন করে বিছানায় পড়ে গেছি, ভয় হয়। স্বাস্থের জন্যে মনে মনে চিরটা কাল যুদ্ধ করেও যখন এই অবস্থা হয়, তখন মনের জোর হারিয়ে ফেলি।

তোমার চিঠি পড়ে নিজেকে অভিশাপ মনে হচ্ছে। অনেক মানুষকে ভুগিয়েছি না জেনে। কারো কারো কষ্ট পাবার তীব্রতা দেখে সমব্যথায় মন আর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ দুঃখ লাঘব করা সম্ভব হয়নি। জানো তো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। আমার নাক দিয়ে অসম্ভব রক্ত পড়ছে। চিন্তা করবার শক্তি নেই। শুধু এটুকু বলি আমার জন্যে যদি এতটুকু কষ্ট পাও তাহলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না। যে হাত দিয়ে তুমি আমার শ্যাওলার দাগ মুছেছে তা সরিয়ে দিতে পারবো না সত্যি, কিন্তু দুনিয়ার নিয়মে আরও দুটো হাত এখন আমাকে তুলে নিতে উদগ্রীব। সে দুটোর দাবি না মানলে আমার রক্ত বিষ হয়ে যাবে যে। আর সে হাতের উপস্থিতিতে তোমার মনে তো কষ্ট হবেই। আমি আজ বুঝিয়ে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছি না। ক্লোরোমাইটসিন বুদ্ধি লুটে নিয়েছে।

পড়তে পড়তে বীথির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। ঠিক যে চিঠিতে ওরা অন্তরংগ সুরে কথা কইছে, সেই একই চিঠিতে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত।

বীথি বুঝতে পারে, বকুলের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাশেম কেন পেল না তার মন? তারপর আরো দুটি চিঠি রয়েছে বকুলের। শেষের চিঠিগুলো পড়ে বীথির মনে হয়েছিল, বকুল ভালোবাসত হাশেমকে, কিন্তু সম্ভব হয়নি, বিচ্ছেদের জের টেনেও তাই মমতা যায়নি বকুলের। অ

সুখের চিঠিটার পরদিনের তারিখেই লেখা—-

এখন অনেকটা সুস্থ। কেমন আছো? আজ আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। খুব হাওয়া দিচ্ছে কিনা। তোমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি এ কদিন।

ছোট্ট চিঠিটা, কিন্তু বীথির সারাটা মন যেন ভরে রইলো। পরের চিঠিটায় বকুলের আবার অসুখ করেছে।

তোমার চিঠি যখন পেলাম তখন আবার আমি বিছানায়। অসুখের জন্যে কেউ এত ব্যাকুল হবে, এতে আমার চোখ সজল হয়ে ওঠে। রাগ করেছি কে বলল?

আমি কী পুণ্য করেছি যে, তুমি এমন করে আমার জন্যে প্রার্থনা করবে? তোমার প্রার্থনায় আমার প্রয়োজন আছে। আজ এই অসুস্থ শরীরে ফল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলেছি। মানুষের জীবনে এমন একেকটা সময় আসে যখন একটার পর একটা বিপদ আসে। তবে কতটুকুই বা আমার ভয়? আমাকে ঘিরে তুমি আছো, তোমার মতো আরো একজন আছেন।

আজ তোমার জন্যে আবার আমি প্রার্থনা করলাম। অজান্তে যে ভার তোমার আত্মায় চাপিয়ে দিয়েছি তা থেকে যেন মুক্তি পাও। তোমার জন্যে আজকে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমাকে ঘেন্না করেও যদি বালিশের ওপর তোমার মুখ নিদ্রামগ্ন থাকতে পারে তবে সেও

ভালো। তবু আমাকে বাসনা করে অন্দ্রি থেকো না। ভাবো, চলতে চলতে আমি থেমে গেছি, তবু তোমাকে যেতে হবে। এতে আমারও কষ্ট, তোমারও কষ্ট। তবু তোমাকে যেতে হবে। এমনি করে ফেলে যাওয়া অনেক ভালো।

চিঠি পড়ে চেনার বদলে আরো যেন কুয়াশা হয়ে উঠেছিল বীথির কাছে। একেকদিন রাতে হাশেম ভাইয়ের জন্যে ভীষণ কান্না পেত বীথির। বকুলকে মনে হতো রাক্ষুসী। মনে মনে অভিশাপ দিত বকুলকে। বীথির যেন সহজ বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, বকুলের জন্যেই ঘর ছেড়েছে হাশেম। চাচিমাকে কথাটা জিগ্যেস করতে সাহস হয়নি। আবুকে সে শুধিয়েছিল, বকুল কে, আবুভাই জানো?

বকুল?

অবাক হয়ে যায় আবু। এই মেয়েটা ও নাম জানল কী করে? পরে হেসে ফেলে ফিসফিস করে বলেছে, কাউকে বলবি না। হাশেম ভাই যে মেয়েটাকে ভালোবাসত তার নাম বকুল। বিয়ে হলো না কেন?

কী জানি। তুই নাম জানলি কী করে? জানিস বীথি, তোর মতো আমিও একদিন চুরি করে চিঠিগুলো পড়েছিলাম।

২. হাশেম জ্বরে কাঁপছে

হাশেম জ্বরে কাঁপছে হি হি করে। বীথি কম্বল এনে দিতেই সেটা গায়ে জড়িয়ে মরার মতো পড়ে রইলো।

মরিয়ম বললেন, তোর চাচাকে অফিসে একটা টেলিফোন কর, বীথি। আর তোর বড় চাচার বাসায় যাবি একবার?

পাশের বাড়িতে এসে চাচাকে টেলিফোন করল সে। মুরশেদ চৌধুরীর গলাটা কী অদ্ভুত শোনাল।

হাশেম ফিরেছে? কখন? রাস্কেলটা এতদিন ছিল কোথায় কিছু বলেছে? চাচার কথা বলার ধরনই ও রকম। পাছে মমতা চোখে পড়ে যায়, বাইরে তাই তম্বি। হাশেমের কাছে বীথি যে হঠাৎ নগ্ন হয়ে পড়েছিল সেই থেকে বুকের কাপুনিটা যাচ্ছে না; কাঁপা গলায় সে উত্তর করল, কিছু বলেনি। জ্বর এসেছে খুব।

আমি এক্ষুনি আসছি।

বীথি ফিরে এসে দেখে মায়ে ছেলের গলা সপ্তমে উঠেছে।

মরিয়ম বলছেন, এসেই পাগলামো শুরু করলি। এই জ্বর নিয়ে ঘরে যাবি না তো রাস্তায় পড়ে মরবি?

না, না, আমাকে কোথাও যেতে হবে না।

চল বাবা, ঘরে গিয়ে শুবি।

এখান থেকে আমি কোথাও নড়তে পারবো না।

মরিয়ম তার কম্বল ধরে টানলেন।

আহ ছাড়ো।

কম্বলটা প্রায় কেড়ে নিয়ে সোফায় কুণ্ডলি পাকিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল হাশেম।

একটু পর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, সবাই, সবাই এমনি করে। জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। কোথাও কি সুস্থির হয়ে থাকতে পেরেছি? যখন চলে যেতে চেয়েছি, দুঃখী সব। মানুষগুলো এসে বলেছে চলে যাবে? তাহলে আমরা বাঁচব কী করে? জানো মা, ওদের চোখের দিকে তাকালে মায়া লাগে। মনে হয়, ওদের বুকের শূন্যতা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। আমার তো মায়া করলে চলে না। তাই পালিয়ে আসতে হয়েছে। দিনের পর দিন, এক গা থেকে আরেক গাঁ।

প্রতিটি নিঃশ্বাসের পর জ্বরের দাপটে হাঁপাতে থাকে হাশেম, তবু থামে না। কথাগুলো তাই বেদনার মতো শোনায়। হাশেম, না মরিয়ম না বীথি কেউ তাকে থামাতে পারে না, বলে চলে, আমি সবাইকে বলি, হতভাগা আমি কে যে আমাকে এমন করে মূল্য দিস? আমাকে অত ওপরে উঠিয়ে তোরা যে শেষে ঠকবি।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাশেম—-কিন্তু তাকি কেউ বুঝতে চায়?

জ্বরটা বোধ হয় ভালো করেই এসেছে। বারবার করে বলে আর জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাতে ব্যর্থ চেষ্টা করে।

তা কি কেউ বুঝতে চায়। তা কি কেউ বুঝতে চায়। আমি একা যদি বিশ্বটাকে বাঁচাতে পারতাম, তাহলে আকাশের সেই সাত রাজার রাজা ব্যাটা আমাকে অমর আয়ু দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতেন রে। বীথি, তুই শুনছিস? তাহলে আমার দৃষ্টি হতো দীপ্তি। কোন খানে এতটুকু অন্ধকার রাখতাম না। সব আলো করে দিতাম। সব আমি আলো করে দিতাম। এখানে ওখানে আমাকে সারা রাত জেগে থাকতে হতো না।

জ্ঞান বোধ হয় হারিয়ে যাচ্ছে হাশেমের। মরিয়ম গিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, মাথায় বুলিয়ে দিলেন মমতার হাত। হাশেম একটুও বাধা দিল না।

মরিয়ম বীথির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তুই যা, বীথি। পারিস তো আবুকেও ধরে আনিস।

বড় চাচাকে খবরটা দিয়ে বীথি এলো ইউনিভার্সিটিতে আবুর খোঁজে। আবু তো জানবে না, বীথি এসেছে হাশেমের সংবাদ নিয়ে। মনে করবে তার রিহার্সেল দেখতে এসেছে। মনে করে খুব খুশি হবে। আজ সকালে বড়ড বকেছিল আবু, সে যাবে না শুনে। বীথির ভয় করছিল, নাশতা কিছু না খেয়েই বুঝি বেরিয়ে যাবে তার ওপর রাগ করে। আশেপাশে ঘুরছিল তাই। যখন দেখেছে আবু খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছে তখন স্বস্তি পেয়েছে। কী ভঙ্গি তার খাওয়ার যেন এক সংগে গোটা প্লেট মুখে পুরতে পারলে শান্তি। দেখে হাসি পেয়েছিল, কিন্তু তার সামনে হাসে নি, পাছে অনর্থ ঘটে। তাহলে আবু আর খেতোই না।

ইউনিভার্সিটিতে গেট পেরিয়ে হাঁটতে থাকে বীথি। কোনদিন আসে নি এখানে। বড় জড়সড় লাগছে। মনে হচ্ছে বিশ্ব তাকিয়ে আছে তার দিকে। মাথার পরে দুপুর রোদে ঝলসে আছে আকাশ। চমকে ওঠে হঠাৎ, হাশেমের সেই কথাটা মনে করে চমকে ওঠে বীথি। তুই এত কষ্ট পাস কেন?

হাশেম কী করে জানল, বীথির এত কষ্ট?—-যে কষ্টর কথা কোনদিন সে কাউকে বলতে পারেনি, যে কষ্ট সইতে না পেরে নিজেকে শান্ত করবার জন্যে একেকদিন তাকে কঠিন প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে।

বুকের ভেতরে দুপ দুপ করতে থাকে বীথির।

কিন্তু কোথায় আবু? কোথায় গিয়ে তার সন্ধান নেবে? কার কাছে গিয়ে শুধোবে, আবুকে দেখেছেন?

করিডরে বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বীথি। একটি মেয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। তাকে অমন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে শুধালো, কাউকে খুঁজছেন?

বীথি নাম বলল। বলল, সে তার বোন।

মেয়েটা ভাবল খানিক। পরে বলল, আসুন আমার সংগে।

বীথিকে সে নিয়ে এলো মেয়েদের কমনরুমে। সেখানে এককোণে গিয়ে বসলো সে। বেয়ারার হাতে একটা স্লিপ পাঠিয়ে মেয়েটা বলল, আপনি বসুন, লোক পাঠালাম খুঁজতে। রিহার্সেল নেই?

আছে, সে তো ছটার দিকে। এই তো কিছুক্ষণ আগেও আমাদের সঙ্গে ছিল। কেন, বাসায়। কিছু হয়েছে নাকি?

বীথি লজ্জা পেয়ে যায়। ভীরু চোখ তুলে বলে, না, না, এমনিতে দরকার।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। দুচোখ ভরে হৈচৈ দেখল মেয়েদের। দেখতে দেখতে কখন যে এদের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল তা বীথি নিজেও বলতে পারবে না।

বেয়ারা এসে খবর দিল, আবুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দূরে সোনালি জমিনে ছোট ছোট লাল ফুল ভোলা শাড়ি পরা একজন পাউরুটি চিবোচ্ছিল। নামটা শুনে সে ওখান থেকেই বীথিকে যে মেয়েটি নিয়ে এসেছিল তাকে শুধালো, কাকে খুঁজছিস?

আবুকে। উনি ওর বোন।

মেয়েটি তখন হাতের পাউরুটি পিরিচে রেখে রাণীর মতো এগিয়ে এলো তার কাছে। বীথি মুগ্ধ হলো। এত ভালো লাগল, চোখ ভরা খুশি নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি বলল, আবুকে বুঝি খুব দরকার। ওকে কি পাওয়া যাবে? ও আজ বিকেল চারটেয় আমাদের বাসায় আসবে।

বীথি চকিতে মুখ তুলে তাকালো খুব সরাসরি করে।

আমি ওকে বললে চলবে?

একটু ইতস্তত করে বীথি উত্তর করল, বলবেন হাশেম ভাই এসেছেন আজ। বেশি রাত যেন না করে।

বলে বেরিয়ে আসে বীথি। কেন যেন মনটা খুব ভার হয়ে গেছে। কারণ খুঁজে পায় না। তাড়া দেয় রিকশঅলাকে। হাশেমের কথা মনে পড়ে। আর বকুল। কেমন ছিল দেখতে?

হাশেম ভাই বুঝলো কী করে, মনে মনে তার এত কষ্ট যে কষ্টের পরিমাপ করতে গিয়ে সে নির্বাক হয়ে গেছে?

সোনালি জমিনে ছোট ছোট লাল ফুল-তোলা শাড়ি। বকুলের কথা ভাবতে গিয়ে, বীথির চোখে এই মেয়েটির মুখ ভেসে উঠতে চায়।

আনমনে হাসলো সে। বকুলকে নিয়ে বড্ড বেশি ভাবছে না কি?

.

আজ সকাল থেকে আবুর দিনটা কেটেছে যেন নেশা লাগানো এক ঘূর্ণির ভেতর দিয়ে। বীথির সেই অমন মাথা নাড়া, কিছুতেই রিহার্সেলে আসতে রাজি না হওয়া, মনটাকে একেবারে মৃত করে রেখেছিল।

বাসা থেকে বেরিয়ে সোজা ইউনিভার্সিটি এসেছিল আবু। এত সকালে এসে কোন দরকার ছিল না, তবু। এসে গুম হয়ে বসে রইলো মধুর দোকানে। তারপর যখন দেখল বিলকিসকে, উঠে দাঁড়াল তার সংগে দেখা করবার জন্যে।

লাইব্রেরীতে যাবে বলে আজ একটু ভোরে ভোরে এসেছিল বিলকিস। প্রচুর দিন কিস্‌সু পড়াশোনা হয়নি, মেলা বই, মেলা টিউটোরিয়াল পড়ে আছে। সেগুলো সারতে হবে। আবুকে দেখে বিস্মিত হলো সে।

শুধালো, কী ব্যাপার?

কিছু না। কিছু না।

চলে যাচ্ছিল আবু। বুঝল বিলকিস। বলল, কথা বলবেন? বাসায় আসুন না। একদিনও তো আসেন নি। আজ চারটের দিকে?

আচ্ছা।

চলি এখন। আজ আমি ভালো ছাত্রী।

বলে বিদ্যুত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে চলে গেছে বিলকিস।

আজ বিকেলে এই প্রথম বিলকিস আবুকে ডেকেছে তার বাসায়। কিন্তু এ নিয়ে এত ভাববার, মন এত প্রস্তুত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবার কী কারণ থাকতে পারে, শাদা চোখে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যতই এগিয়ে এলো ঘড়ির কাঁটা বিকেল চারটের দিকে, ততই অস্থিরতা বেড়ে উঠলো আবুর। এমন হলো যে, বেলা বারোটা না পেরোতেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হলে সবার সঙ্গ ছেড়ে, ইউনিভার্সিটি ছেড়ে, এমনকি একটা জরুরি টিউটোরিয়াল ক্লাশ পালিয়ে। দুপুরের রোদের মধ্যে খুব লম্বা করে হাঁটবার একটা প্রেরণা পেল। যেন এতকাল যার জন্যে প্রতীক্ষা তাকে হাতের কাছে পেয়ে পালাতে চায় আবু।

কিন্তু বিলকিস তো এমন কিছু রত্নমানিক আজ তাকে প্রতিজ্ঞা করেনি। ওই একটা দোষ আবুর। বিলকিসকে কিছুতেই সে যেন সহজ চোখে দেখতে পারে না।

বিলকিস হয়ত জিগ্যেস করল, কী কেমন আছেন?

ভালো।

কথাটা বলেই তার ভারী সাধ হয় বিলকিসের কাঁধ আলতো হাতে স্পর্শ করে, চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, আর তুমি?

কিন্তু বলা হয় না। বিলকিসের সামনে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সে মনে মনে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ একটা খসড়া দেখতে পায়। যেন শুনতে পায় বিলকিস বলছে, আমিও ভালো। তারপর সে কল্পনা করে, বিলকিস একটা নীরব মুহূর্ত যেতে দিয়ে, ব্যথায় নীল হয়ে বলছে, ভালো আছি। কিন্তু শরীরের ভালো লাগা নিয়ে আমার গা জ্বালা করে, আবু। মন আমার ভরে উঠবে কবে বলতে পারো?

এ সব কিছুই হয় না। একটু পর আবু সত্যি সত্যি যে প্রশ্নটা করতে পারে তা হচ্ছে আপনি কেমন আছেন?

প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে গিয়ে কণ্ঠে বারোয়ারি সুর ছাড়া আর কিছুই আনা সম্ভব হয় না। অতি মাত্রায় পোষাকী, সযত্নে বাঁচিয়ে চলা একটা দূর উচ্চারণ।

এই দ্বিধা নিয়ে, এই কিছু বলতে না পারা নিয়ে নিজেকে একেকদিন যাচ্ছে তাই বলে গাল দিয়েছে আবু। সে তিরস্কারের এক ভগ্নাংশও অন্য কাউকে করা হলে রক্তপাত হতে পারত। একেকদিন আবুর ইচ্ছে হয়েছে, নিজের আঙুল দাঁত কামড়ে রক্ত বার করে ফেলে।

একদিন খুব জেদ হয়ে গিয়েছিল আবুর। আজ সে বিলকিসকে নিয়ে যা হোক একটা কিছু করে বসবেই। হাতের তাস সোজা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি। এখন তুমি কী করবে বলো?

দিনটা ছিল ছুটির দিন।

বাথরুমে গিয়ে বালতি বালতি পানি ঢেলে নেয়ে ওঠে আবু। হাতের আঙুল চুপসে শাদা হয়ে যায়। তখন বেরিয়ে আসে। অস্থির পায়ে হাঁটতে থাকে বারান্দায়। মাকে দেখা যায়। বীথি পাশ দিয়ে চলে যায়। তবু কারো দিকে দৃষ্টি পড়ে না তার। হাঁটতে থাকে। বাগানে এসে বসে। আবার ঘরে যায়। এমনি করে অবশেষে একসময়ে বেরিয়ে আসে। তক্ষুনি রিকশা পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আবুকে। অনেকক্ষণ মানে দুমিনিট। সেই দুমিনিটে বিশ্বের রিকশাঅলা মনে মনে তার অভিসম্পাত কুড়িয়েছে।

কিন্তু রিকশা পেয়েও, অর্ধেকটা পথ এসেও, বিলকিসের কাছে যাওয়া হয়নি সেদিন।

একটা রেস্তোরাঁয় বসে খুব দামি ঠাণ্ডা পানীয়ের ফরমাস করেছে। মনে মনে বলেছে, না গিয়ে ভালোই করেছি। বিলকিস যদি চটে যেত, তাহলে চিরদিনের মতো আমার কাছে ওর দুয়ার বন্ধ হয়ে যেত। সেটা তো আরো মর্মান্তিক। তার চেয়ে এই ভালো।

রেস্তোরাঁ সোফায় গা এলিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আরেকদিন যাবো। মেলে ধরবো আমার দুহাত। বলব—- দাও, আমাকে দাও।

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করা হয়ে ওঠে না। মনের ভেতরে কেবলি সে ফুঁসতে থাকে অক্ষমতার জ্বালায়।

ইউনিভার্সিটির ভিড়ের ভেতরে চোখে পড়ে বিলকিসের মুখ। কিংবা দূর থেকে তার চলে যাওয়ার তরংগ। কিংবা হাসি, অন্য কারো জন্যে অন্য কোন মুহূর্তে। চকিত হতে হয় বিলকিসের কণ্ঠস্বরে। কোন দিন বা হাত মুক্ত রেখে ডান হাতে বই খাতা কোলের কাছে ধরে মাটির দিকে চিবুক নামিয়ে চলে যায় বিলকিস। বিলকিসের একটা শাড়ি শাদা, একটা ময়ূর নীল, একটা সমুদ্র-নীল, একটা আকাশ নীল, একটা শুধু নীলের আভাস, একটা সোনালি। জমিনে ছোট ছোট লাল ফুল তোলা, আর একটা সবুজ-ছায়া-ছায়া পাতায় পাতায় আচ্ছন্ন। সিনেমা হলে একদিন অন্ধকারে সমুখের কাধ চেনা মনে হয়—-আলো জ্বললে বুকে কাপন ওঠে—-বিলকিস। নীলখেত ব্যারাকের রেলক্রসিং-এ মোটর বাঁধা পড়েছে; নীল রং কন্সালের জানালায় বিলকিসকে দেখা যায় বই ওটাতে ওল্টাতে হাই তুলছে। ইউনিভার্সিটিতে সাহিত্য সভায় বিলকিস একটা সরল রেখার মতো দাঁড়িয়ে তুখোড় ইংরেজিতে বক্তৃতা করছে, সমালোচনার ছুরিতে কোণঠাসা করে ফেলছে কোনো আত্মতৃপ্ত, বানানো অনুভূতি সর্ব, খ্যাতিমান তরুণ লেখককে।

একেকটা রূপ যেন বারুদের একেকটা কাঠি। আবুর প্রত্যক্ষ হলেই যেন তীব্র দীপ্তিতে জ্বলে ওঠে। সে আগুনে তখন আর বিলকিসকে দেখা যায় না। আগুনের ভেতর দিয়ে যে বিলকিসকে দেখা যায়, সে আবুর নিজস্ব পৃথিবীতে তারই চেতনার তুলিতে আঁকা।

আর কথা। বিলকিসেব কথাগুলোও যেন হৃদয়ের মধ্যে লাল আগুন ধরাতে জানে।

খুব সাধারণ একটা কথা। বিলকিস হয়ত একদিন বলেছে, আমাদের বাসায় কাল চোর এসেছিল। রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে আমার এমনিতেই ভয় করে। যা ভয় করছিল।

কল্পনার ফুল দল মেলতে থাকে। আবু ভাবে, বিলকিসের হঠাৎ ঘুম ভাঙলে ভয় করে। ভয় পেলে কেমন দেখায় বিলকিসকে? তার যেন মনে হয়, কাল রাতে বিলকিসের সঙ্গে সে শুয়ে ছিলো। চোরের শব্দে ধরমড়িয়ে উঠে বসেছে সে, বিলকিস, আর আবু তাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, ভয় কী, ভয় কী, এই তো আমি।

তখন বিলকিসের মুখ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চুলে। তার ভেতর থেকে পৃথিবীর প্রতীকের মতো মুখটাকে আবিষ্কার করে সে তখন যেন চেপে ধরেছে নিজের মুখের সঙ্গে।

কিংবা হয়ত একদিন কথা হচ্ছিল গেটের কাছে বাড়ি যাবার আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মাথার পরে দেখিয়ে বিলকিস বলল, দেখেছেন গাছগুলো?

হ্যাঁ, কেন?

ভারী সুন্দর, না?

আবু তাকায় আকাশের দিকে। সেখানে সবুজ পাতায় সোনার মতো রোদ পড়ে আছে।

বিলকিস বলে, একেক সময় আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, পাতায় ছাওয়া এই রাস্তাটা যদি কোন দিন না ফুরাতো। মনে করুন না, পৃথিবীর শেষ অবধি এমনি করে

চলে গেছে গাছের পর গাছ। নিচে পীচের রাস্তা। না, না, লাল মাটির রাস্তা। লাল মাটিতে ডালের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ায় মানুষ পথ চলছে।

আকাশের দিকে, গাছের দিকে, ছায়ার দিকে তাকিয়ে বিলকিস কথাগুলো বলে। চোখ দিয়ে তাকে আর মন দিয়ে তার কল্পনাকে অনুসরণ করে আবু। মনের ভেতরে তার সাড়া ভাঙতে থাকে যেন।

অনেক অনেক আগে আবু যখন ছোট ছিল, তখন একেক দিন, কী জানি কেন অভিমান হলে মরে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মানুষ মরে যায় কী করে? আট ন বছরের ছেলেটার তা বোঝার কথা নয়। মনে আছে, তখন অভিমানটা বুকে পুষে আবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত পথে। পথের দুধারে ছিল এমনি গাছ আর গাছ। হাঁটতে হাঁটতে পাথরের পথ শেষ হতো। তারপর ধুলো ভাঙা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। ধুলোর ভেতর দিয়ে, গাছের কোল ঘেঁষে, কখনোবা দাঁড়িয়ে পড়ে গাছের গায়ে বেয়ে ওঠা একটা লাল পিঁপড়ে মেরে আবু চলে যেত সেই কোন্ দূরে।

একটু একটু করে আকাশটা মায়ের মুখের মতো হয়ে আসছে। মাথার ওপরে বিরাট আমগাছটায় পাখিদের কাকলি শুনে বাসার সমুখে ছেলেদের কোলাহল মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন আবু একটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে পা দিয়ে ধুলোয় চক্র আঁকতে থাকে। হয়ত হাটবার ছিল। হাটে যাচ্ছে পশারীর দল। তাদের পেছনে পেছনে শহরে ফিরে এসেছে আবু।

বড় হয়ে যখন মনে পড়েছে এই সব চলে যাওয়ার কথা, তখন আবুর মনে হয়েছে, যেখানে সে চলে যেত আসলে সে জায়গাটা আর এ পৃথিবীতে নেই। সেখানে এখন মৃত্যু ছাড়া আর কিছুতেই ফিরে যেতে পারবে না আবু।

সেই আট ন বছর বয়সে এমনি করে কতবার মরে গেছে আবু। মরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।

বিলকিসের ওই একটা গুণ আবুকে মুগ্ধ করে রাখে। নিজের ভাবনাটাকে সম্পূর্ণ করে, বিশ্লেষণ করে না বলে থামতে জানে না বিলকিস। অন্য কোনো মানুষের ঠোঁটে যে কথাগুলো শুনে মনে হতে পারত, বানিয়ে বলছে, সেই কথাগুলোই যখন বিলকিস বলে তখন তার পেছনে অন্তরকে অনুভব করা যায়।

বিলকিসের কথা শুনে আবু বলে, তা কি হয়?

হয় না। হয় না বলেই তো দুঃখ হচ্ছে। যতটুকু হয় না মানুষ মন দিয়ে তা ভরে তুলতে চায় যে।

আবুর তখন ইচ্ছে করে অনেক কথা বলতে। কথা খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকে। রিকশা পেলে চলে যায় বিলকিস।

সেদিন রাতে শুয়ে শুয়ে আবু ভাবতে থাকে, বিলকিসের কি কোনদিন অমন মরে যেতে ইচ্ছা করেছে? হয়ত অনেকদিন আগে বিলকিসও অভিমান করে মরে যাবার জন্যে পায়ে পায়ে চলেছে—-যে পথে দুধারে ছিল ঠাণ্ডা ছায়া মেলানো গাছ। আজ এই গাছগুলো দেখে তার মনেও কি ফিরে ফিরে আসতে চেয়েছিল সেই স্মৃতি?

মনে মনে বিলকিসের ছোটবেলা সৃষ্টি করতে থাকে আবু। এত বিশদ করে ভাবতে থাকে। যে, এক সময়ে চোখের সমুখে প্রত্যক্ষ করতে পারে ছোট্ট মেয়েটিকে, যার নাম বিলকিস। এমন একদিন দুদিন নয়, অনেকদিন মনে হয়েছে তার। এমন ক্ষমতা যদি থাকত, যার অলৌকিক বলে সে ফিরে যেতে পারত বিলকিসের শৈশবের পৃথিবীতে, মেলাতে পারত নিজেকে তার সংগে, তার সেই পরিবেশকে করে নিতে পারত নিজের পরিবেশ, তাহলে নতুন সুন্দর জীবন হতো তার। তাহলে ঘর থেকে পা বাড়ালেই দেখা হতো বিলকিসের সংগে। তখন বিলকিসের সংগে পাথরের পথ ভাংগা চলত, বেণি নিয়ে টানাটানি করা যেত, কোচড়ভরা বেতফলে ভাগ বসানো যেত তার।

তা হলে অনেক সহজ হয়ে যেত সব কিছু। সহজ হয়ে যত নিজেকে উন্মুক্ত করা। এমন করে দ্বিধায়, সংকোচে, অভিমানে তাকে জ্বলে পুড়ে মরতে হতো না। তাহলে বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে সে বলতে পারত, তোর কি চোখ নেই, বিলকিস? আমার ভোলা দরোজা দিয়ে আয়। তোর জন্যে খুলে রেখেছি যে।

একদিন, এমনি এক ভাবনার চূড়ান্ত চূড়োয় নিজের চোখে হাত রেখেছিল আবু। সেখানে অশ্রু টলটল করবে, উষ্ণ তরল বিকারহীন অশ্রু, এ যেন তার কতকালের জানা।

আজ হঠাৎ ওভাবে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে তার বেরিয়ে পড়বার কারণ ছিল। মনের ভাবনাগুলো রীতিমত সশরীর হয়ে মাথার ভেতরে দুপদাপ লাগিয়েছে তখন থেকে।

বিকেল চারটেয় দেখা হবে বিলকিসের সংগে। এখনো অনেক দেরি তার। কিন্তু অলক্ষিতে কোথায় কোন এক ঘড়িতে যেন ইতিমধ্যেই বিকেল চারটে বেজে গেছে।

মাথার পরে এখনো খাড়া রোদ। পথ দিয়ে এলোপাথারি চলতে চলতে আবু যেন স্পষ্ট শুনতে পায় বিলকিস তাকে দেখে বলছে, এত দেরি করে এলেন?

তখন ও উত্তর করছে, দেরি করে যাবো বলেই দেরি করে এলাম। যদি সত্যি দেরি হয়ে থাকে, ক্ষমা করে দিন।

তার কথা শুনে বিলকিস যেন হাসলো।

আবু ভারতে থাকে, তখন সে বলবে, আপনাদের এখানে এই প্রথম এলাম। ভারী সুন্দর বাসা। আপনাদের নিজের?

হ্যাঁ।

কিছু ফুলগাছ এনে বাগান করুন।

কে করবে?

কেন, আপনি?

আর আমি বাগান করেছি!

বলেই বিলকিস যেন খুব ক্লান্ত এমনি একটা ভঙ্গিতে হাত তুলেই নামিয়ে নেবে। কিন্তু তার চোখ আলোকিত থাকবে এক নামহীন খুশিতে। পরে শুধোবে, আপনার বুঝি বাগান করার শখ?

বলতে পারবে না আবু। কেবল বলবে, কিছুটা।

কী ফুল করেছেন? নিয়ে যাবেন একদিন দেখাতে?

যাবেন? সত্যি যাবেন? কবে বলুন।

তাহলে কাল।

বেশ তো।

তারপর কাল বাগান দেখে ফেরার পথে আবু আচমকা বলবে বিলকিসকে, কখনো ভালোবেসেছেন?

শুনে বিস্মিত হবে বিলকিস। বিস্মিত হয়ে পরকহীন চোখে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। তারপর কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করবে, লাজনা হয়ে, অস্পষ্ট মাথা নেড়ে, না, না। আমিও না।

তখন বিলকিসের শরীর স্পর্শ করে আবু বলবে, কী জানি কেন, সারাক্ষণ খুব একা মনে হয়। মনে হয়, কোথায় কে যেন ঐ দিগন্তটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। অথচ চিনতে পারি না, কাছে যেতে পারি না। বলতে পারেন কেন এমন হয়?

কী জানি।

তখন বিলকিস সুন্দর একটি স্বর হয়ে উঠবে।

আমি অনুভব করতে পারছি, চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি, আপনি তাকে চিনতে পারছেন না। আপনার মনে তখন খুব ঝড় দিয়েছে। তখন দুহাত বাড়িয়ে সেই দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে কাছে করছেন। আমি আমার দুচোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি যে।

তার উত্তরে আবু তাকে দুহাতে জড়িয়ে বলবে, এইতো আমি কাছে করেছি।

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে চারটে বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি। বিলকিসদের বাসায় পৌঁছুতে লাগবে পনেরো মিনিট। চারটে পাঁচে গিয়ে পৌঁছুবে। সেটা হয়ত সময় রক্ষা হলেও শোভন হবে না মোটেই।

চারটে বলেছে বলে চারটেয় পৌঁছুতে হবে? তাতে করে যেন তার আগ্রহটা ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়ে এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলো আবু। কিন্তু কী দুর্ভাগ্যক্রমে সে ঢুকেছিল এই দোকানটায়। তার পুরনো বন্ধু কামাল বসে ছিল একগাদা ফাইল টাইল চায়ের ছড়ানো সরঞ্জাম আর সিগারেটের খোলা প্যাকেট নিয়ে। স্কুল ফাইন্যাল থেকে আই, এ, অবধি একসাথে পড়ে আবু এলো ইউনিভার্সিটিতে আর কামাল গিয়েছিল তার বাপের ব্যবসায়। কামাল দুহাত তুলে হৈচৈ একটা কাণ্ড বাধিয়ে বলল, আরে এসো এসো। কতকাল পরে দেখা।

তাকে দেখে, তার কথা শুনে, আবু খুশি হতে পারল না। একটা বিদঘুঁটে পাথর এসে যেন তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। তবু চেষ্টা করে যতটা প্রীত হওয়া গেল সেটাই যথেষ্ট হলো। কামালের জন্যে। কামাল খুশি হয়ে টেবিল চাপড়ে বলল, চা খাও।

ঘড়ির দিকে তাকাল আবু। তাকিয়ে একটু উসখুস করে উঠল।

আর কিছু?

অন্যদিকে ইতস্তত দৃষ্টি করছিল আবু। এখন যেন মনে হচ্ছে, বিলকিসের কাছে তার পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। চোখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, না, না।

খাও না কিছু।

কামাল তার হাতে ঠেলা দিয়ে কথাটা বলল; বড়ড ভালগার মনে হলো তখন তাকে। আবারো শুধালো, চপ?

না।

কাটলেট?

না।

তো কী খাবে?

আবু যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। কিছু বুঝতে না পেরে কামালেরই খোলা প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরালো। সিগারেট সে বড় একটা খায় না। এখন মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভালো কিছু নেই। এতে করে দুরন্ত আঙুলগুলো তবু ঠাণ্ডা থাকছে। কামাল আবার জিগ্যেস করল, কেক? পেশট্রি?

বললাম তো শুধু চা। তা নয়, তুমি একেবারে পুরো মেনু মুখস্ত বলতে লেগেছ।

তার কথা শুনে হা হা করে হাসল কামাল। হাসতে গিয়ে তার রোগা মুখটার অনুপাতে অসম্ভব বড় একটা হাঁ সৃষ্টি হলো। বলল, না হয় বিজনেসে লসই খাচ্ছি, তাই বলে বন্ধু বান্ধবকে খুশি করবার মতো অবস্থা নেই? এই দ্যাখোনা, জুন থেকে ডিসেম্বর, পাকা ছটি মাস— আবু বাধা দিল।

কামাল, এক্ষুনি যেতে হবে এক জায়গায়। একেবারে ভুলে গেছি। খুব দরকার।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল আবু। কামালকে এক লহমার সুযোগ দিল না। নইলে ঝাড়া দুঘণ্টা তার বকবকানি শুনতে হতো।

একেবারে মনেই ছিল না। আরেকদিন তোমার চা পেশট্রি চপ কাটলেট যা আছে সব খাওয়া যাবে। চলি।

বাইরে বেরিয়ে আবু যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে। বেরিয়ে আসবার মুখে জোর করে হাসতেও হয়েছিল একবার। বাইরে এসে হঠাৎ সে অনুভব করে পেশীতে হাসিটা তখনো আঁকড়ে আছে।

বিরক্ত হয়ে মুহূর্তে সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে আবু রিকশা নেয়।

বিলকিসদের বাসায় যখন পৌঁছুলো তখন প্রায় সাড়ে চারটে। মাত্র আধঘণ্টা। দেরিটা এখনো ভদ্রতার সীমারেখা পেরিয়ে যায়নি দেখে আবু মনে মনে খুশিই হলো।

একবার ইতস্তত করল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। নীল বার্ণিশ করা কাঠের দরোজা। হঠাৎ মনের মধ্যে ভীষণ একটা টান অনুভব করল আবু। ফিরে যাবে? যেন দেখা না হলেই পরম একটা স্বস্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু ফিরে যাওয়াও যায় না আর। কেউ দেখলে বলবে কী, লোকটা দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে না ডেকেই চলে যাচ্ছে। কত কী ভাবতে পারে ঐ তো মোড়ে দাঁড়ানো লোকটাই। কিংবা বিলকিস যদি দেখে ফেলে দোতলা থেকে?

প্রায় সংগে সংগে বছর দশেকের একটা মেয়ে দৌড়ে এসে দরোজা খুলে প্রজাপতির মতো জিগ্যেস করল, কাকে চান?

আন্দাজ করে আবু বলল, তোমার আপাকে।

মেয়েটি শরীর দুলিয়ে বলল, নেই তো। আপনার একটা চিঠি আছে। এখন চারটে বাজে না?

হ্যাঁ।

আবুর মাথার মধ্যে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। বোকার মতো সে জিগ্যেস করল, নেই?

উহু। বাইরে গেছে। দাঁড়ান, যাবেন না।

চিঠি এনে দিল মেয়েটি। সে চিঠিতে লেখা আছে—-

আপনাদের বাসা থেকে কে একজন এসে ইউনিভার্সিটিতে খুঁজছিল আপনাকে। তক্ষুণি যেতে বলেছিল। বাসায় কে যেন এসেছেন বলল। নামটা মনে করতে পারছি না। বারবার বলে গেছে দেরি করবেন না যেন। ভালোই হলো, আমাকেও হঠাৎ একটা দরকারে বেরুতে হতো। তাতে না জমত আলাপ, মাঝ থেকে শুধু শুধু কষ্ট করতেন। কিছু মনে করবেন না। আরেক দিন আসবেন?

এক মুহূর্ত কি ভাবল আবু। চিঠিটার মর্ম ভালো করে বুঝলোও না। আগাগোড়াই যেন বিলকিসের ব্যঙ্গ–তাকে ডাকা, ডেকে না থাকা। হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল সে। খাতা খুলে লিখল—- আমি না এলে কারো কিছু এসে যাবে না আশা করি। আরেকটা তারিখ নাইবা নিলেন।

পাতাটা ছিঁড়ে ভাঁজ করে মেয়েটোকে দিয়ে বলল, তোমার আপাকে চিঠিটা দিও।

৩. ডাক্তার এসে চলে গেছে

ডাক্তার এসে চলে গেছে। বাবা এসেছেন, বড় চাচা এসেছেন, আবু এসেছে সবাই এসেছে। মাহবুব জরুরি কাজে ব্যস্ত, পরে আসবে জানিয়েছে। যেন হাট লেগেছে আজ মরিয়মের বাড়িতে।

কিন্তু হাশেমকে কি সুস্থির রাখা যায়?

থেকে থেকেই বিছানা ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে রক্তচোখে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছে। তার রকম দেখে না কাছে আসা যায়, না কিছু বলা যায়।

বিছানায় কি সহজে আসতে চেয়েছিল? সেই বাইরের ঘরেই গো ধরে বসে থাকবে। কেউ তাকে একচুল নড়াতে পারেনি। ইতিমধ্যে জ্বরের ঘোরে একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সেই তখন ধরাধরি করে নিয়ে আসা হয়েছিল ওপরের ঘরে।

জ্ঞান ফিরেছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। সাহস করে বড় চাচা খোরশেদ চৌধুরী স্মিত মুখে এগিয়ে আসেন। হাশেম তার দিকে দৃষ্টিবাণ হানে, যেন এই লোকটাকে চিনতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার। কিছুতেই মনে পড়ছে না কোথায় দেখেছে। খোরশেদ চৌধুরী বললেন, তোমরা সবাই যাও তো এ ঘর থেকে। দেখি আমি ওকে বোঝাতে পারি কি না।

তারপর হাশেমের কাঁধে হাত রেখে ডাকলেন, এসো।

কী হলো হাশেমের, মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করল তাঁকে। গিয়ে সুবোধ ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ল।

খুব কষ্ট হচ্ছে, বাবা?

না। নাতো।

আমাকে চিনতে পারছিস?

হুঁ।

কে আমি বলতো?

বড় চাচা। ছেলেমানুষের মতো টান তুলে উচ্চারণ করে হাশেম। শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। যাকে কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছিল না, সে হঠাৎ এত শান্ত হয়ে গেল কী করে?

খোরশেদ চৌধুরী তখন হাশেমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, একটু চুপ করে থাকো। কেমন? নইলে সেরে উঠবে কী করে?

হাশেম তক্ষুনি চোখ বুজে তাঁর কথা পালন করলো।

খোরশেদ চৌধুরী মুখ ফিরিয়ে ভাইকে বললেন, দেখেছ মুরশেদ, এখনো আমার কথা ভোলেননি। পাগল হলে কী হবে, ঠিক মনে আছে।

তারপর হাশেমকে দেখিয়ে মরিয়মকে বললেন, ছোটবেলায় পুরো একটা বছর আমার কাছে। ছিল যে। আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমোত! এই ছোট্ট এতটুকুন। শোধও ছিল না, বোধও ছিল না। তারপরে–না এলো মুরশেদ রেঙ্গুন থেকে।

হাশেম হবার পরপরই চাকুরি সূত্রে মুরশেদ চৌধুরী এক বছরের জন্যে রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। এক বাসাতেই থাকতেন তখন তিন ভাই। খোরশেদ চৌধুরী তখন, এখনো নিঃসন্তান। হাশেমকে সেই একটা বছর বুকে করে রাখার স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি। খোরশেদ চৌধুরীর চোখ সজল হয়ে উঠতে চায় যেন। বিব্রত হয়ে শাদা চুলের ভেতরে হাত চালাতে থাকেন খামোকা। মরিয়মকে বলেন, তোমার ভাগ্য ভালো এমন ছেলে কোলে পেয়েছিলে। কে বলল ও পাগল হয়েছে? আমি পাগল চিনি না? যেমন ছেলে তেমনি আছে।

হঠাৎ হাশেম চোখ খুলে বলল, পানি।

তাড়াতাড়ি গেলাশ ভরে পানি এনে দেন মরিয়ম। হাশেম ঢকঢক করে পানিটুকু খেয়ে বিছানা থেকে আবার নেমে যেতে চায়।

খোরশেদ চৌধুরী বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

না, না, কী কচ্ছিস?

আহ।

যেন অসীম বিরক্ত হয়েছে হাশেম বাধা পেয়ে।

ছেড়ে দিন আমাকে। আজ আমার খুব অস্থির লাগছে যে। খালি হাঁটতে ইচ্ছে করছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে। বলুন, কথা বলুন।

বড় চাচার হাত ধরে বিষম ঝাঁকুনি দেয় হাশেম। তারপর উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে থাকে। বলে, ভয় হয়, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু

জানালার কাছে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হাশেম। মাথা নত করে কী যেন ভাবল। কিসসু বুঝতে পারেন না মুরশেদ চৌধুরী। বাড়ির বড় ছেলে অমন করে চলে যাওয়াতে আঘাত তিনি কম পান নি। এবার ছেলেটাকে সুস্থ মানুষের মতো দাঁড়াতে দেখে গলা খাকারি দিয়ে শুধোলেন, এতকাল ছিলি কোথায়, হাশেম?

স্বামীর প্রশ্নে মরিয়মও এগিয়ে আসেন। কাছে এসে তিনিও জিগ্যেস করেন, হ্যাঁরে, হঠাৎ চলে গেলি, একবার বাপ-মার কথা মনে পড়ল না? চলে গেলি কেন, হাশেম? কী তোকে

দিতে পারিনি, বলবি না? তোর বাবার কান্না শুনে পথের মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ত, আর তোর কানে গিয়ে পৌঁছোয় নি?

খোরশেদ চৌধুরী ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে ওঠেন, এ সব কথা এখন থাক।

হাশেম আবার পায়চারি করতে শুরু করল। তারপর ধপ করে একটা চেয়ারে বসে, বুকের কাছে দুপা টেনে নিয়ে একটা বাঁধা কবুতরের মতো ম্লান হয়ে রইল। বলল, কম্বলটা দাও।

কম্বলটা হাতে পেয়ে ভালো করে গায়ে জড়াতে জড়াতে অপরূপ পরিতৃপ্ত দেখালো তাকে। বলল, একবার এক গাঁয়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে দাঁড়িয়ে দেখলাম, বিরাট এক পুকুর। সেই এ মাথা থেকে ও মাথা। শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষ পাগলের মতো পানি তুলে ফেলছে।

তার কথা শুনে ঘরের ভেতরে সবাই চুপ হয়ে গেছে। হাশেমের কণ্ঠ যেন কোন এক সুদূরের দেশ থেকে ভেসে আসছে। এই যে ছেলেটা, যাকে তারা দেখেছেন জন্ম থেকে, তার ভেতরে আজ সম্পূর্ণ অজানা এক পৃথিবীর অস্তিত্ব টের পেয়ে বড় চাচা, মা, সবাই বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছেন। যেন তাদের নতুন চোখ খুলে যাচ্ছে। হাশেম বলে চলেছে, আমি দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলাম, হ্যাঁগো ভাল মানুষ, এখানে আজ কিসের উদ্যোগ? একটা লোক, তামার মত তার। গায়ের বরণ, খালি গা, মাথায় লাল গামছা বাধা। সে বলল, খাঁ সাহেবের হুকুম হয়েছে পুকুর থেকে তামাম পানি তুলে ফেলতে হবে। আমি শুধোলাম,

কেন? তখন আরেকটা লোক জবাব করলো, এ পুকুর যে ফি বছর মানুষ খায়। সাঁতার দিয়ে মাঝপুকুরে গেলে আর ফিরে। আসে না, তাই এবার খা সাহেবের হুকুম হয়েছে পুকুর থেকে পানি তুলে দেখবেন তলায় কী আছে? হাশেম মৃদু হাসলো এইখানে থেমে। কাণ্ড দ্যাখো। মানুষটা কী ক্ষ্যাপা। বলে কী না, পুকুর শুকিয়ে দেখবে কোন রাক্ষস হাঁ মেলে আছে তার পাতালে। সেদিন সারাটা দিন দাঁড়িয়ে ছিলাম কাঠফাটা রোদ্দুরে। চারধারের ফেটে যাওয়া মাঠে নহর বইলো। তবু যদি এক আঙ্গুল পানি কমলো পুকুরের। যত তুলে ফেলছে, কল কল কল কল করে পানি তত বাড়ছেই। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার রক্ত ওরা নিঙড়ে নিঙড়ে ছেঁকে তুলছে।

বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে হাশেম। প্রথমে মনে হয়, চোখ বুজে ভাবছে, দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু না, ঘুম এসেছে তার। একটানা কথা বলতে বলতে অবশ হয়ে গেছে স্নায়ু। তাকে তুলে এনে শুইয়ে দেয়া হলো বিছানায়। মরিয়ম গিয়ে বসলেন তার শিয়রে।

বারান্দায় এসে খোরশেদ চৌধুরী ভাইকে বললেন, হ্যাঁ ভালো কথা মুরশেদ, গেল কাল। ছোটমিয়া চিঠি লিখেছে বীথির ব্যাপারে। তোমাকে একটা কথা বলা দরকার।

খোরশেদ চৌধুরীকে তখন বড় বিব্রত দেখাচ্ছিল। কাল চিঠি পেয়ে অবধি মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না, বুঝতেও পারছেন না কী করে কথাটা পড়বেন। মুরশেদ চৌধুরী উদ্বিগ্ন হয়ে ভাইয়ের দিকে তাকালেন। বীথির নাম শুনে বুঝতেই পারলেন না তার আবার কি হতে পারে। বিহ্বল হয়ে বললেন, বীথি, বীথির কী?

কিছু না।

খোরশেদ চৌধুরী ভাইকে ভরসা দেয়ার মত করে হাসেন। আমতা আমতা করে বলেন, ইয়ে, লিখেছে যে, আবুর সংগে বীথির মেলামেশাটা কেমন যেন দেখাচ্ছে। মানে, তুমি বীথিকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দাও না?

ভেতর থেকে কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন মরিয়ম। মাথায় ঘোমটা তুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে চোখ নত করলেন খোরশেদ চৌধুরী।

.

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানে নির্মম হাতে ফুল ছিড়ছিল বীথি। বাসার বাঁ পাশে অনেকদিন থেকে অনেকটা খালি জায়গা পড়ে ছিল। আবু সেখানে বাগান করেছে। এক কোণে দুটো বুড়ো বাতাবি নেবুর গাছ। তারপরেই দেয়াল। ওপারে রাস্তা। বীথির পরনে ছিল তাঁতের গাঢ় সবুজ শাড়ি। অন্ধকারে দূর থেকে ভালো করে ঠাওর হয় না। থোকা থোকা অন্ধকারের ভেতর থেকে শাদা শাদা ফুল আর কিসের তন্দ্রা-সৌরভ যেন জ্যোতি হয় বেরুচ্ছে। চারদিকের ব্যস্ততা আর কোলাহল যেন দেয়ালের ওপারে ঠেকিয়ে রেখেছে এক মায়াবিনী হাত। আবু তাকে ওপরতলা নিচতলা খুঁজে খুঁজে হয়রান হলো।

মাকে জিগ্যেস করল, মা বীথি কই?

মরিয়ম বিরক্ত হলেন।

এই সন্ধ্যেয় বীথি বীথি করে চাঁচাস নে তো।

নামাজ পড়ে রান্না ঘরে যাচ্ছিলেন তিনি, তার পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে আবু বলল, ছেলে ফিরে এসে দেখি তোমার মেজাজটাই বদলে গেছে।

আজ মায়ের অপ্রসন্ন মুখ দেখে আবুর বিস্ময় যেন বাধ মানছিল না। মরিয়ম বললেন, মাতামাতি করিস বলেই তো মেজাজ করতে হয়।

কেন? আজ নতুন নাকি?

নতুন না হলেও বীথি বড় হয়েছে।

কোনোদিন যে ছেলের ওপর রাগ করেননি তাকে বকতে গিয়ে চোখে পানি এসে যায়। তার ওপর ভরসন্ধ্যে। বুক কাঁপতে থাকে মরিয়মের। কিছু না বলে অশ্রু চেপে চলে যান। বোকার মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আবু।

অবশেষে বীথিকে পাওয়া গেল বাগানে। সে তখন বেলি গাছটার সর্বনাশ করেছে সবকটা ফুল ছিঁড়ে। একটা ডাল করুণ হয়ে কাঁপছে তার হাতের মুঠোয়। আবু তার পেছনে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইলো খানিক। বীথিকে ডাকতে গিয়ে কেমন সংকোচ হচ্ছে তার এই

প্রথম। আর বুঝতে পারছে না বীথির কাছে গাছটা কী অপরাধ করেছিল। ইতস্তত করে সে অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল, শোন।

শুনল, বীথিমুখ ফেরাল না। তার শরীরে একটা অস্পস্ট সাড়া জাগল শুধু। হাতের ডালটা ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে ফিরে গেল। আবু জিগ্যেস করল, এখানে কী করছিস?

বীথি জবাব দিল না।

পায়ের কাছে ফুলের শাদা শাদা অংশ ছড়িয়ে আছে। বেলি গাছটা আবুর খুব প্রিয়। কিন্তু আবু কণ্ঠ নামিয়ে মমতা করে বলল, অমন করে সব ছিড়লি কেন? আমি তোকে সারাটা বাড়ি খুঁজে খুঁজে পাচ্ছি না। কিরে?

হঠাৎ আবুর মনে হলো তার সামনে বীথির বদলে বিলকিস পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। বীথিকে খুঁজতে এসে যেন বিলকিসকে আবিষ্কার করে ফেলেছে সে তার বাগানে। বলল, বুঝতে পারছি আজ তোরও মেজাজ হয়েছে।

মোটেও না।

এই এতক্ষণ পর একটা কথা উচ্চারণ করল বীথি। তারপর সরে এসে সিঁড়ির একটা ধাপে বসে রইলো।

তখন আবু এসে তার নিচের ধাপে বসলো। তার দিকে তাকালো না। জিগ্যেস করল, হাশেম ভাইকে দেখলি?

হ্যাঁ।

আমাকে দেখে বুঝলি, বীথি, আমার চোখের দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে রইলো।

বীথির দিকে তাকালো আবু। কেঁপে উঠলো বীথির বুক।

ও–কী, কথা বলছিস না যে? কথা বলবি না তো মর।

তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে, যেন বীথিকে সে মোটেই উদ্দেশ করছে না, এমনি করে বলে, মা–ও খুব মেজাজ দেখালেন আজ। সারা বাড়িটার যে কী হয়েছে তোরাই বুঝিস। তুই আমার শত্রু, বুঝলি?

বীথি চমকে চোখ ফিরিয়ে বলল, কেন, চাচিমা কী বলেছেন?

কিছু না। তুই শুনে কী করবি?

আবু আর বসে থাকতে পারল না। চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। আবার তক্ষুনি চলে না গিয়ে বলল, আচ্ছা, আমাকে সত্যি করে বলতো কী হয়েছে?

বীথি বুঝতে পারে না, ভয় হয়, আবু বুঝি তার অন্তর পড়ে ফেলেছে। নিজেকে তাই পাথর করে রাখে সে। কী একটা বলতে গিয়ে বলতে পারে না। কোনোরকমে পায়ের কড়ে আঙুলে সিঁড়ির একটা ভাঙ্গা কোণ আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। আবু বলে, বুঝতে পেরেছি, আজ তুই আমাকে পড়তে দিবিনে, খেতে দিবিনে, এমনি করে জ্বালিয়ে মারবি তুই।

মানুষের একেক সময় কী হয়, শখের পুতুল নিজের হাতে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলে। কণ্ঠে তিক্ততা এনে বীথি বলে, কেন, আমি তোমার কী করেছি?

কী করিসনি বল?

আবু আবার সিঁড়ির ধাপে বসে। বসে যোগ করে, তুই কি মনে করেছিস, অমন মেজাজ করে থাকলে আমি আজ খেতে পারব? না, দুদণ্ড বই খুলে বসতে পারবো?

বীথি হঠাৎ পরিপূর্ণ চোখ তুলে তাকাল আবুর দিকে। আত্মার ভেতরে চুর চুর হয়ে যেতে যেতে সে উচ্চারণ করল, আমাকে তুমি কেন জ্বালাতে আসো, আবু ভাই?

.

বুকের ভেতরটা জ্বলতে থাকে বীথির। বাতি নিবিয়ে চুপচাপ অন্ধকারে শুয়ে থাকে। মনে মনে একা হয়ে যায় সবার কাছ থেকে। মাথার ভেতরে ফিরে আসে আবার সেই ভাবনা হাশেম ভাই কী করে জানলেন, আমি কষ্ট পাই? যেন কষ্টটার কথা কেউ বলে দেয়াতেই কষ্টের মাত্রা গেছে বেড়ে। একদিন, অনেকদিন আগে আবু তাকে বলেছিল, বীথি, আমার সংগে বেরুবি?

বীথি থাকত চুপচাপ। বড় একটা কারো সামনে বেরুতো না, কোথাও যেত না। সে যে এ বাড়িরই একজন একেক সময় যেন টের পাওয়া যেত না তাও। আর আবুর সংগে তার কথা হতো একেবারেই কম। সেদিন আবুর এ প্রস্তাব শুনে সে থতমত খেয়ে যায়। পরক্ষণে আবছা খুশি লাগে। বেরিয়েছিল আবুর সংগে। আবুর যেন ঘোর লেগেছিল সেদিন। পকেটে যা পয়সা ছিল সব খরচ করেছে রিকশয় রেস্তোরাঁয় বীথিকে নিয়ে। হাতে যা সময় ছিল সব। উড়িয়ে দিয়েছে অস্থির হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে। কোনখানেই দুদণ্ডের বেশি তার মন টেকেনি। বিকেল থেকে শুরু করে সন্ধ্যের সেই অনেক পর অবধি এই কাণ্ড। বীথির যে কী নামহীন আনন্দ হচ্ছিল সেদিন। কিন্তু বাইরে তার কোন জানান দেয়নি। লজ্জা করেছে। বুকের ভেতর তরংগ উঠেছে।

সন্ধ্যের পর আবু বলল, চল, কোথাও গিয়ে বসিগে।

না, না।

বীথির ভয় করে। আবু পরামর্শ দেয়, তাহলে হাঁটি কিছুক্ষণ?

হাঁটতে হাঁটতে রেসকোর্সের কাছে এসে পড়ে ওরা। পথ ছেড়ে পাড়ি দিতে থাকে বিশাল ময়দান। আবু বলে, তুই খুব একা, নারে বীথি? সারাদিন বই আর কলেজ। একেক সময় আমার খুব রাগ হয় তোর ওপর।

বারে, পড়াশোনা করব না?

করবি তো। তাই বলে অন্ধ হয়ে থাকবি?

বীথি বুঝতেই পারে না আবুর আজ কী হয়েছে। তাকে একেবারে অন্যমানুষ মনে হচ্ছে। অন্ধ হয়ে থাকার অর্থটাও কিছুতেই বোধগম্য হয় না। সেটা টের পেয়েই আবু যেন খেদ করে বলতে থাকে, মানুষ তো অন্ধই। অন্ধ নইলে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়? বলতে হয়, এইতো এখানে। কিরে, চুপ করে আছিস যে? তোর খারাপ লাগছে?

নাতো।

তবে?

আমি কী বলব?

আবু যেন আপন মনেই আবর্তের মতো ঘুরতে থাকে। প্রথমে একটু চটে যায়। বলে, তোকে কিছু বলতে বলেছি নাকি?

পরে মমতায় ভিজিয়ে আনে কণ্ঠ।

—-হারে, এত যে বকছি, তুই রাগ করছিস না? তোকে যেন মানাচ্ছে না মোটে। তুই আমাকে চটে উঠছিস না কেন? আমার বিচ্ছিরি লাগছে।

বীথি মৃদু গলায় বলে, আমি রাগ করতে জানি না।

ঐটুকু বলতে গিয়েই যেন হাঁপ ধরে যায়। গা কেঁপে ওঠে। আবু ওর হাতটাকে অন্যমনস্কভাবে মুঠোর ভেতরে নিয়ে পথ চলতে শুরু করেছে। যেন খুব তন্ময় হয়ে কী ভাবছে।

অনেকক্ষণ পরে সে বলে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অনেক কষ্ট, বীথি। তুই যা ভালো বুঝবি, করতে পারবি নে। বাইরে থেকে যে কেউ বাধা দেয়, তাও না। মনে হয়, মানুষগুলো সব নিজের শত্রু। জানিস বীথি, তোকে দেখে যেন বুঝতে পারি আমি বেঁচে আছি।

বীথির মনে ছোটখাটো একটা ঝড় ওঠে। আবুর জন্যে কেমন বেপরোয়া টান পড়ে বুকের ভেতরে। বলে, বাসায় চলো।

তোর খারাপ লাগছে?

বীথি উত্তর দেয় না। আবু হেসে বলে, জানি তুই রাগ করেছিস। তোকে এসব কথা বলতে গেলাম কেন? কী জানি কেন বললাম। আমাকে খুব অমানুষ অভদ্র বলে মনে হচ্ছে তোর, না?

বীথি বলতে চায়, নাতো। কিন্তু পারে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটবার পর আবু যেন হঠাৎ রুখে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, তাহলে তুই আমার সামনে এসে দাঁড়ালি কেন, বীথি? আমাকেও কি পাগল বানিয়ে ঘর ছাড়া করতে চাস?

কী বলছ, আবু ভাই!

বীথি আর্তনাদ করে ওঠে।

ঠিকই বলছি। আমি তোর কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়েছি, না দাঁড়াব যে তুই অমন রানীর মতো মুখ বুজে থাকবি?

তুমি ঘর ছাড়বে কেন?

কী জানি! বড়চাচা বলেন, হাশেম ভাই সাধু হয়ে গেছে। আসল ব্যাপারটা তো জানি আমি। বীথির কৌতূহল হয়। এসে অবধি সে হাশেমের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কথাই শুনছে। কেন গেছে, ভালো করে কেউ তাকে বলতে পারেনি। বীথি সব ভুলে গিয়ে শুধোয়, কী হয়েছিল?

আবু মুখ ফিরিয়ে বলে, কাউকে বলিস না যেন। হাশেম ভাই ভালোবাসতো। ভালোবেসে। ঘর ছেড়েছে। তোর বিশ্বাস হয় না?

বুকের ভেতরটা বরফ হয়ে যায় বীথির। আবু বলে, এক একজন অমন করেই ভালবাসে, বীথি। কোন বাধ মানে না, যুক্তি বোঝে না। পাথরের সংগে আত্মার বিয়ে দিয়ে দেয় ওরা।

—-নে, একটা রিকশ ডাকি। বাড়ি চল।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসেই মরিয়মের সমুখে পড়ে গেল ওরা দুজন। আবু চলে গেল ভেতরে। মরিয়ম জিগ্যেস করলেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বীথিকে, কোথায় গিছলি?

একমুহূর্ত ভাবলো মেয়েটা। বলল, বড় চাচার বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি আবু ভাই। তার কথা শুনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অবাক হলো আবু।

আরেকটা দিনের কথা মনে করতে পারে বীথি।

আবু ইউনিভার্সিটি যাবার আগে গোসল করে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে তার দরোজায় দাঁড়িয়ে বলল, কী করছিস?

কিছু না।

তোর চিরুণিটা দে, সিথি করি। ইস, চুলগুলো যা বেয়াড়া লম্বা হয়েছে।

বীথি চিরুণি দিয়ে বলে, সেলুনে গেলেই পারো। ভীষণ আলসে আর নোংরা হয়েছ তুমি। আবু সিথি করতে করতে উত্তর দেয়, তাই বুঝি রোজ আমার ঘর সাজিয়ে রাখিস তুই?

রাখতো বীথি। কিন্তু মিথ্যে করে বলল, বয়ে গেছে। চাচিমা করেন।

আমার কি চোখ নেই?

আবু হাসতে হাসতে বলেছিল কথাটা। কিন্তু কতখানি যে মোচড় তুলল বীথির বুকে তা যদি আবু জানতো!

আবু চিরুণি রেখে বলল, কাল বিকেলে মনে হলো তুই যেন আমার ঘরে এলি। আমি বার থেকে ফিরে এসে শুয়েছিলাম। তুই টের পেলি কী করে যে ঘুমোচ্ছি? আমার মুখ

দেখছিলি কেন? কী চুরি করতে এসেছিলি? আমি যদি তখন খপ করে তোর হাত ধরে ফেলতাম। তোমার কি বুদ্ধি লোপ পেল, আবু ভাই?

কী জানি।

ঘরে ফিরে এসে ঘুমোচ্ছিল আবু। বিকেল ছটা ঘুমোনোর সময় নয়। বীথি তাকে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠেছিল। বুঝি অসুখ করেছে। পা টিপে ঘরে এসে আবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। কিছু ঠাওর করতে না পেরে কপালে হাত রেখেছিল। আবু যদি তার তাকিয়ে থাকা টের পেয়ে থাকে তো কপালে হাত রাখার কথা বললো না কেন?

আবু বলল, আমার ঘরে অমন করে আসিস না। শুধু শুধু কষ্ট পাবি। কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কী? আবু চলে যায়। দোটানায় পড়ে বীথি আছাড় খেতে থাকে কেবলি। এই যদি বলবে তো আবু অমন করে তাকে নিয়ে কেন একেকদিন মেতে ওঠে? বীথি বুঝতে পারে না। কান্না পেতে থাকে। আবুর ওপরে চটে যায়। তখন পেন্সিল আঙুলের মধ্যে বুনে ব্যথা সৃষ্টি করতে থাকে বীথি।

এর কদিন পরেই বীথিকে নিয়ে আবার বেরোনোর উদ্যোগ করে আবু। বীথি বাধা দেয়। বলে, আমার সময় নেই।

ইস্, আজকাল বড়ড সময়জ্ঞান হয়েছে তোর।

হবে না?

বীথি তখন মনে মনে ভাবছে, শুধু শুধু কষ্ট এনে লাভ কী? তার চেয়ে এই ভালো, এই ভেতরের মরে যাওয়া, জেদ করে বসে থাকা। আবুর দিকে তার মন লতিয়ে উঠতে শুরু করে। দিয়েছে। তার শেকড় কেটে ফেলার পণ করে বীথি। কিন্তু কিছুতেই ফেরানো যায় না আবুকে। বেরুতেই হয়। অনিচ্ছার সংগে আপোষ করতে গিয়ে সে নিশ্চুপ হয়ে রইলো সারাক্ষণ।

আবু সারা রাস্তা ধরে কী বকতে থাকে তার একবর্ণ কানে যায় না বীথির। রিকশায় তার পাশে চুপ করে বসে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে পিছিয়ে পড়ে। আবুকে বারবার থেমে ধরতে হয়। পার্কে বেঞ্চে পাশাপাশি বসেও মনে হয়, বীথি একাই বসে আছে, আৰু আবু সমানে কথা বলে। এক আধটা হ্যাঁ না ছাড়া আর কিছু বলার উৎসাহ পায় না বীল নিজেকে বড় একা আর নিঃস্ব মনে হয় তার।

আবু চটে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি একটা ছোটলোক। বুঝলি, আমি একটা ছোটলোক। আমার সংগে বেরোস কেন?

আসলে বীথির ব্যবহার দেখে যে রাগটা হচ্ছিল, সেটা নিজেকে বকে মেটায়। হন্ হন্ করে চলে যায় তাকে সত্যি সত্যি একলা ফেলে। বীথির তখন খুব খারাপ লাগে। নিজের জেদ দেখে নিজেকেই আর পছন্দ করতে পারে না। মনটা বলতে থাকে, দৌড়ে গিয়ে

মানুষটাকে ডেকে আনতে। মনে হয় আবুর সামনে আছাড় খেয়ে পড়ে বলে, আমাকে নিয়ে তুমি যা খুশি করো। তোমার যাতে সুখ আমারো তাতে অন্তরের সায়।

কিন্তু আশেপাশে মানুষ রয়েছে যে, তারা বলবে কী? মাথা হেঁট করে পার্ক থেকে বেরিয়ে আসে বীথি।

এমনি করে মাসের পর মাস ভুগতে থাকে বীথি। আবুর জন্যে থেকে থেকে অস্থির হয়ে ওঠে তার আত্মা। উনখ, অসহনীয় মনে হয় শরীরের একেকটা স্নায়ু। কিন্তু কিছু করা যায় না যে। তার বদলে জোর করে বীথি পড়া নিয়ে, কলেজ নিয়ে ডুবে থাকতে চায় সারাক্ষণ। আর বাকি সময়টুকু নিজেকে ব্যস্ত রাখে রান্নাঘরে, সংসারের কাজে।

ভেতরটা তো জানা যাচ্ছে না, মরিয়ম চোখে যা দেখলেন বড়ড বিব্রত বোধ করলেন। পরের মেয়ে পড়তে এসেছে, কদিনইবা থাকবে, তাকে ঘরের কাজ রোজ রোজ করতে দেখলে লোকে বলবে কী? একদিন তাকে বলতে শোনা গেল, বীথি, আবার তুই ঝাড় হাতে নিয়েছিস? তোকে কতবার মানা করবো বলতো।

বীথি হেসে বলে, চাচিমা, তুমি রান্না করছ। ঘরটা আমি সামলালে কী হয়? সারাদিন তুমি একা সব করবে, সে হবে না।

তার জন্যে বীথির মমতা দেখে মনে মনে খুশি হন মরিয়ম। কিন্তু বাইরে জানান দেন না। কপট আহত কণ্ঠে বলেন, যা খুশি করগে বাপু।

রান্নাঘর থেকে সন্ধ্যের আগে তিনি বেরিয়ে দেখেন, বীথি যে শুধু ঘরটাই ঝাঁট দিয়ে রেখেছে তা নয়, তার জন্যে জায়নামাজটা পর্যন্ত বিছিয়ে রেখেছে। আর বারান্দায় পরিষ্কার করে মাজা এনামেলের বদনায় ওজুর পানি। মরিয়মের মন তখন ভীষণ প্রসন্ন হয়ে ওঠে। নামাজ পড়ে উঠে বীথির ঘরে এসে কথা বলার ছলে তার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দোয়া মাখিয়ে দেন। বীথি সেটা বুঝতে পারে। অনেকক্ষণ তার মন নির্মল হয়ে থাকে। মনে হতে থাকে, কই তার কষ্ট?

হাশেমের কাছে লেখা বকুলের চিঠিগুলো পড়ে অবধি নিজেকে বোঝা যেন অনেক সহজ হয়ে যায় বীথির। মনের ভেতরে যা হয়, এতকাল তা যেন বোঝা যেত না, কথা দিয়ে ধরা যেত না। এখন ভাষা খুঁজে পাওয়া গেছে বকুলের চিঠি থেকে।

কষ্ট, আত্মা, সৌন্দর্য এই কথাগুলোর অর্থ যে নতুন ব্যঞ্জনায় কত অপরূপ হয়ে উঠতে পাবে, এই একেকটা ছোট্ট শব্দ যে কত বিরাট অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে, তা জেনে অবধি বীথির অন্তরটা মুখর হয়ে আছে। কথা বলতে ইচ্ছে করে আবুর সংগে।

কিন্তু বলা হয় না। ভেতর থেকে কিসের সংকোচ বোবা করে রাখে তাকে।

আবুকে সামনে পেলে মুখ অন্ধকার করে থাকা, তার কথার জবাব না দেয়া, জবাব দিলেও ইচ্ছে করে দুঃখ দেয়ার স্বভাবগুলো যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

কিন্তু হৃদয়ের এই বিশাল তরংগকে সে ঠেকিয়ে রাখবে কী করে? বেঁধে রাখতে গিয়ে তার দোলা আরো প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। তার দুর্বার ধাক্কায় একেকদিন বীথি এই বাস্তব পৃথিবীর কুল থেকে অন্য অজানায় আছাড় খেয়ে পড়ে চেতনার প্রদোষ–প্রতিম আলোয়।

একদিন হয়েছিল এমনি। সে রাতের কথা আজো স্পষ্ট মনে আছে বীথির। আৰু এসে তার বারান্দায় পায়চারি করছিল। শুয়ে শুয়ে টের পায় বীথি। সমস্ত অনুভূতি আর ইন্দ্রিয় সুচীমুখ হয়ে ওঠে। মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হতে থাকে। বাইরে অবিরাম শোনা যাচ্ছে তার পায়ে পায়ে চলার শব্দ। বীথির আত্মা যেন সমুদ্রের মতো আছড়ে উঠতে চায়। বলতে চায়, কেন তুমি এলে আবু ভাই? আবু দরোজার কাছে মুখ রেখে বলে, বীথি, আয়।

না।

আয় নারে।

ডাকটায় কী ছিল, বীথি উঠে আসে তখন।

আবুর শাদা পাজামা অন্ধকারে একটা পতাকার মতো কাঁপতে থাকে বাতাসে। তার শরীরটাকে কী দীপ্তিময় মনে হয়। মনে হয়, আবু তার ভাবনা থেকে জন্ম নিয়ে আজ এই রাতে অশান্ত হয়ে বীথির দরোজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আবুকে সে একটা সৌরভের মতো মেখে নিতে পারবে যেন, এত অবাস্তব অশরীর মনে হয় তার উপস্থিতি।

তার মতো আবুরও কি কষ্ট হচ্ছে আজ?

আবু ওর হাত ধরে বলে, কেমন বাতাস দিয়েছে দেখেছিস, বীথি? বাগানে গিয়ে বসবি একটু? ভয় নেইরে, আমি তোকে আর জ্বালাবো না।

বীথি তাকে অনুসরণ করে।

বাগানের সিঁড়িতে হাত ধরে বীথিকে বসায় আবু। আর নিজে হাঁটতে থাকে অন্ধকারে। অন্ধকারে দাঁড়ানো গাছের ভেতর দিয়ে। ভেতর থেকে বেরিয়ে তারার অস্পষ্ট আলোর ভেতরে।

আবু আপন মনে বলে, তোকে কেন ডাকলাম, বীথি?

আর্তনাদের মতো শোনায় যেন আবুর কণ্ঠস্বর। বীথির মায়া হয়। তোকে কেন ডাকলাম? তোকে কি ডাকতে চেয়েছি? আজ এই রাতটা আমাকে যেন জ্বালিয়ে মারছে। মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে আগুন ঝরে আমার একা অন্তরটাকে খাক করে দিচ্ছে। কী করি বলতো? বড়ড ভয় করছে। এক মুহূর্তের জন্যে ভুল হলো, যেন তুই আমাকে শান্ত করতে পারবি। কিন্তু তা হচ্ছে কই?

আবু এসে তার পাশে বসে। বলে, তোর হাতটা দে।

বলে নিজেই বীথির হাতটা টেনে নেয়।

তোর ভয় করছে, বীথি?

না।

তাহলে হাত কাঁপছে কেনরে?

হাতটা ফেলে দেয় আবু। খেদ ভরা কণ্ঠে বলে, আমার হাতে সাহস নেই, বীথি। নইলে সবাই অমন দেয়াল তুলে রাখে, দেয়ালটা ভাঙতে চাই, পারি না। আমাকে দিয়ে কিস্‌সু হবে না, দেখিস তুই।

বীথি চুপ করে শোনে। বলে, তোমাকে দেখে আমার ভয় করে, আবু ভাই। হাশেম ভাইয়ের। মতো তুমিও না একদিন ঘর ছেড়ে বেরোও।

আবু ওর চোখে চোখে তাকায়।

তোরও কি তাই মন হয়, বীথি?

তুমি একটু ভালো থাকতে পারো না, আবু ভাই? আমি যদি কিছু করতে পারি, বলো। বীথির কণ্ঠ স্পর্শ করে আবুকে। এক মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে। পরে বলে, আয়

তাহলে। বীথিকে বুকের ভেতরে চেপে ধরে আবু। চুলের ভেতরে মুখ রেখে বলে, আমার চোখ ঢেকে দে, বীথি! আমার যে কী হয়েছে, খালি অস্থির লাগছে।

বীথি চুপ করে পড়ে থাকে খানিকক্ষণ। তার কানের ভেতর দিয়ে আত্মায় এসে ঘা দিচ্ছে। আবুর হৃদস্পন্দনের শব্দ। শব্দটা অলৌকিক মনে হয়। মনে হয়, আরেক পৃথিবী থেকে সাংকেতিক বার্তা আসছে।

অস্থির হয়ে ওঠে বীথি।

আবু তাকে ঠাস্ করে ছেড়ে দিয়ে বলে, তুইও পালালি। কী শূন্য হয়ে আছে এইখানটায়। থাকতে পারলি না তো।

বীথি দুহাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে।

আবু উঠে দাঁড়ায়। বলে, বলেছি, তোকে জ্বালাবো না। জ্বলতে এলি কেন? আমার মুখের ওপর দরোজাটা বন্ধ করে দিতে পারলি না?

আবু অন্যমনস্কভাবে খুব করে হাঁটতে থাকে বাগানে। ফিরে এসে বলে, তুই আমাকে ছুঁয়ে যাবার স্পর্ধা করেছিস, বীথি। কিন্তু আমি তোকে নিয়ে খেলা করছি বুঝতে পারলি না কেন? হ্যাঁ, সত্যি। আমার চোখের ভেতরে তুই নেই। তাকিয়ে দ্যাখ।

বীথি হাঁটুর ভেতরে মুখ লুকোয়।

আবু বলে চলে, আমি তো বুঝি, মানুষের এ কষ্টটা কী ভীষণ। মরে যাবি তুই। আমাকে কষ্ট জ্বালানোর কাজ দিনে বীথি। তাতে আমার আরো কষ্ট। দেখছিস না, কিসের যে নেশা আমি নিজেই জানি না, তবু কষ্ট হয় শুধু। যদি লাফ দিয়ে মরতে পারতাম তো ভালো হতো। কিন্তু সে সাহসও নেই।

বীথিকে হাত ধরে তুলে আনে আবু।

তোর মুখ দেখে মায়া হয়। চল বাগানে একটু হাঁটবি।

কাটা কবুতরের মতো বিছানায় পড়ে ছটফট করতে থাকে বীথি। মাথার ভেতরে যেন একপাল যন্ত্রণা সোর বাধিয়েছে। না থামানো যায়, না সহ্য করা যায়।

অস্ফুট আর্তনাদ করতে থাকে মাথার দুরগ টিপে। হারিয়ে যেতে চায় বালিশে ব্যর্থ মুখ লুকিয়ে। ডান হাতটা কেবলি এপাশ ওপাশ করতে থাকে যেন এমনি করলে, যে ছবিগুলো মনের পর্দায় ফিরে আসছে, তারা মুছে যাবে।

মরিয়ম এসে ডাকলেন, ঘর অন্ধকার কেন, বীথি? ঘুমোলি নাকি? খাবিনে?

হঠাৎ শুনতে পেলেন বীথির কাতর শব্দ। বুঝতে পারলেন না সেটা তাঁর মনেরই ভুল কিনা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মেয়েটার মাথায় হাত রাখলেন। ইস, কী ঘামছে।

বীথি, বীথি রে।

মা।

অস্ফুট ডাকটা শুনে বিহ্বল হয়ে গেলেন মরিয়ম। একেবারে খাটের ওপর উঠে বীথির মাথাটা কোলের ভেতরে তুলে নিয়ে বললেন, এই তো মা, এই যে আমি। কী হয়েছে, সোনা আমার? কিছু না, কিছু না! তুমি কেন এলে, চাচিমা?

মরিয়মের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বীথি কেন এমন করছে বুঝতে না পেরে, আকুলি বিকুলি করতে থাকেন। যেন নিজের মেয়েটা, যদি নিজের মেয়ে থাকত মরিয়মের, তাহলে আজ তার কোলে মাথা রেখে এমনি কাতরাতো।

আমাকে তুই বলবিনে কী হয়েছে?

হঠাৎ ভয় পান মরিয়ম। আজ বিকেলে খোরশেদ চৌধুরী যে কথা আবুর বাপকে ডেকে বলেছেন, বীথির কানে তা যায় নি তো?

যাবার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন, কথা যখন উঠেছে মোরশেদ, তখন সত্যি না হলেও মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিও না। ছোট মিয়া লিখেছে, বীথিকে হোস্টেলে দেবে। আমারও মনে হয়, কিছুদিনের জন্যে অন্তত বীথিকে দূরে সরিয়ে রাখা ভালো। এখন কিছু বলো না। মেয়েটাকে। দিন দুই পরে আমার বাসায় দিয়ে এসো। তারপর ওর বাবা এসে যা হয় করবে। হাজার হোক মেয়ে তো ওর।

কথাটা শুনে অবধি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন মরিয়ম। এই মেয়েটা যে তাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না, এই ব্যথাটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এমনকি এই সেদিনও এক মাস থাকবে বলে বাড়ি গিয়েছিল বীথি। কিন্তু মাত্র পনেরো দিন পরেই তার বাবা তাকে নিয়ে ফেরৎ এসেছেন।

তিনি এসে বলেছিলেন, আপনিই ওর মা হয়ে গেছেন, ভাবী। মেয়ের মন যেন টিকতেই চায় না আমাদের ওখানে।

সে কথা মনে করে মরিয়মের এখন ভীষণ কান্না পায়। বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরেন বীথিকে। বীথিও তাকে আঁকড়ে ধছে কাতরাতে থাকে, চাচিমা, চাচিমা গো।

ডাকে আর ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে। কেন কাঁদছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। কিন্তু মরিয়মকে জড়িয়ে ধরে বুক ভরে কেঁদে পরম এক নির্ভরতা ফিরে পায় বীথি। দুজনের ভেতরে একটা বোঝাঁপড়া হয়ে যায় যেন অলক্ষিতে।

মরিয়ম তার কপালে, চুলের ভেতরে, বুকে হাত বুলিয়ে তার মুখের ওপর নিজের গাল চেপে ধরে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেন, বীথি, তুই আমার কাছেই থাকবি। তোকে কোথাও যেতে হবে না। সোনা আমার, চুপ কর, চুপ কর একটু।

ভোর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় আবুর। আর একটু পরেই উঠবে আর একটি দিনের সূর্য। এখনো আকাশ থেকে আঁধার কাটেনি। এখনো ভালো করে ঠাওর করলে একটি দুটি তারা আবিষ্কার করা যাবে। আর বইছে কী নির্মল বাতাস। বিলকিসকে মনে হয় এই নিঝুম নিস্তরঙ্গ ভোরের মতো অস্পষ্ট, বিশাল, দৃষ্টির অতীত, রহস্যময়। তখন আকাশের মতো শুদ্ধ এবং গম্ভীর একটি বেদনা যেন বিলকিসের নাম হয়ে জন্ম নিল আবুর মনে।

অপূর্ণ, অক্ষম একটা পুঞ্জীভূত ইচ্ছার চাপে আবুর ভেতরটা ভারী হয়ে উঠছে। যেন সে ভীষণভাবে পরাজিত হয়ে গেছে কাল বিলকিসের কাছে। যে স্রোতটা উৎস থেকে লাফিয়ে গড়িয়ে এতকাল চলছিল, হঠাৎ একটা পাথরের মুখে পড়ে তা স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন! মরে যাওয়াই তো ভালো। কী ক্ষতি হবে কার, এখন যদি মরে যায় আবু? যাকে রক্ত দিয়ে ভালোবাসা গেল, সে যদি চিরকাল রইল দেয়ালের আড়ালে, তাহলে শুকিয়ে যাক রক্তের ধারা। কাল বিলকিসের সঙ্গে দেখা হলো না বিধাতার কোন্ অজ্ঞাত ইচ্ছায়? স্তব্ধ হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে আবু। দূরে, ছড়ানোমেলানো শহরটা কী অপরূপ শান্তিতে শুয়ে আছে। বিলকিস কি কখনো জানতে পারবে, তার জন্য মরে যাচ্ছে আবু? আস্তে আস্তে আকাশটায় লাগছে শাদা রং। বীথি বালিশ থেকে বিছানায় মাথা রেখে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছে। বালিশের ওপর মেলানো তার চুল। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় বীথির মুখ এক মুঠো মমতা হয়ে আছে। কাল রাতে মরিয়ম শুয়েছিলেন এ ঘরে। একটু

আগে উঠে গেছেন ফজরের নামাজ আদা করবার জন্যে। ওপাশের বারান্দা থেকে শব্দ আসছে তার ওজুর।

দরোজা ঠেলে খাটের পাশে এসে বসলো আবু। খোলা দরোজা দিয়ে এলো হাওয়া। হাওয়ার ঝলকে বীথির কোমল মুখোনা যেন অবগাহন করে উঠলো।

বিলকিসও এখন শুয়ে আছে এমনি করে। বালিশ থেকে হয়তো তার মাথাও ঘুমের ঘোরে নেমে এসেছে। শিয়র ভরে উঠেছে একরাশ খোলাচুলের ঐশ্বর্যে। বুকটা উঠছে নামছে।

আবু করতল দিয়ে সন্তর্পণে স্পর্শ করল বীথির গাল। মনে মনে বলল, ঘুমিয়ে থাক, ঘুমিয়ে থাক, আমাকে দেখতে দে।

বীথির মুখ দুহাতে তুলে বালিশে রাখতে গেল আবু। বীথি চোখ মেলল। চোখ মেলবার আগে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল আবুকে।

আমি, বীথি।

একটু পরে সে বলল, কাল রাতে কী হয়েছিল রে?

আবুর কণ্ঠ ভোরের মত আবছা আবছা, তেমনি সুদূর।

কী হয়েছিল তোর? কাঁদছিলি কেন?

বীথি পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকাল আবুর দিকে।

—-আমার ঘরে শুয়ে থেকে শুনছিলাম তুই কাঁদছিস। মনে করলাম তোর কাছে উঠে আসি। কিন্তু তুই যে মেজাজ করেছিলি কাল। এলে কি আমাকে তাড়িয়ে দিতি?

বীথি কথা বলে না। চুপ করে থাকে দুজনে। আবু বীথিকে করতল দিয়ে স্পর্শ করে থাকে। কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, আমাকে একবার ডাকলে কি আসতাম নারে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবু।

হঠাৎ বীথি মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবুর করতল থেকে নিজেকে সরিয়ে বালিশের ওপর বলে, তোমাকে কি আমার সব কথা বলতে হবে?

না তাকিয়েও বীথি অনুভব করতে পারে, আবু আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

৪. বারান্দায় এসে হাশেমের মুখোমুখি

বারান্দায় এসে হাশেমের মুখোমুখি পড়ে যায় আবু। দ্যাখে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাশেম। যেন আবুর জন্যেই অপেক্ষা করছে সে।

হাশেম ডাকল, আবু, শোন।

চোখ তুলে দেখল, থরথর করে কাঁপছে, দুপয়ে দাঁড়াতে পারছে না হাশেম। দুচোখ ফেটে যেন কিসের ব্যাকুলতা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আবু হাত বাড়িয়ে ধরলো তাকে, নইলে বোধ হয় মুখ থুবড়ে পড়েই যেত মানুষটা।

একটা কাজ করতে পারবি?

তার কথায় কান না দিয়ে আবু বলে, বিছানায় চলো। না কি একটা ইজিচেয়ার পেতে দেব? জ্বর একটু কমেছে বলেই উঠতে হয় নাকি?

ম্লান হাসিতে সূর্য হয়ে ওঠে হাশেমের মুখ। বলে, নারে না, আমার কিসসু হয়নি। শরীরটা কেবল মনের ওপর শোধ নিচ্ছে। অনেক দিনের রাগ কিনা! তোরা তাও হতে দিবিনে? আমার কিসসু দরকার নেই।

মুখে যতই বলুক, দুর্বলতার ঘোরে স্পষ্ট টলতে থাকে হাশেম। আবুকে শক্ত করে ধরে শুধোয়, বকুলের খবর জানিস, আবু? বকুল কোথায় আছে?

হাশেমের মুখে বকুলের নাম শুনে চমকে ওঠে আবু। একমুহূর্ত কোন জবাব দিতে পারে না। বকুল বকুলের সংবাদ সে জানবে কী করে? বকুলকে সে দেখেও নি কোনোদিন। বকুল তার কাছে কেবল একটা নাম ছাড়া আর কিছুই না। শুনেছিল, বছর খানেক আগে তার বিয়ে হয়ে গেছে।

আবু বলল, ঢাকাতেই আছে শুনেছিলাম। সেগুনবাগানে না কোথায়।

আমাকে আজ ঠিকানাটা এনে দিতে পারবি?

আবু অবাক হয়ে ভাবে, হাশেম ভাই কী জানেন বকুলের বিয়ে হয়ে গেছে? কথাটা জানাতে গিয়েও সাহস হয় না হাশেমের চোখে সাত রাজ্যের আকুলতা দেখে। সে আশ্বাস দিয়ে বলে, আচ্ছা দেখব।

হাশেম তখন স্বস্তি পেয়ে আবুকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের দিকে এগোতে চায়, কিন্তু পারে না। মাটিতে পড়ে যাবার আগেই আবু তাকে বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরে। বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেয়। কী জানি কী হয়, বিছানায় শুয়ে ঘামে, অস্থিরতায়, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে। হাশেম যেন অনেক বড় একটা মাঠ পাড়ি দিয়ে এসেছে। বড় বড় চোখ মেলে আবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। আবু আবার বলে, আচ্ছা, দেখব আজ।

দুপুরে মাহবুব এলো হাশেমকে দেখতে। তার আগে সকালেই মাহবুবের বউ ফাতেমা এসেছিল। আজ ওরা দুজন এখানেই খাবে।

হাশেম মাহবুবকে দেখে বলল, কিরে, ভালো আছিস?

ঐ এক রকম।

মাহবুব মাথা নিচু করে উত্তর দেয়। ওর ওটা একটা স্বভাব। কথা বলতে গিয়ে, সে যে হোক না কেন, যে কথাই হোক না কেন, কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়বে।

পুরনো স্বভাবটা এখনো যায় নি দেখে হাশেমের ভারী চেনা মনে হলো মাহবুবকে। ছোটবেলা থেকেই ছেলেটা অমন। হাশেমের মনে হলো ছোটবেলার মাহবুবকে এক অলৌকিক বলে সে ফিরে পেয়েছে। যেন আর একটু পরেই মাহবুব বেরিয়ে গিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে ও পাড়ার ছেলেদের ব্যাডমিন্টন খেলা দেখতে লেগে যাবে। ফিরে এসে বায়না ধরবে আমাকেও র‍্যাকেট কিনে দাও, কর্ক কিনে দাও।

হাশেম বালিশটাকে পিঠের নিচে এনে মাথা উঁচু করে শুলো। মৃদু হেসে বলল, তোর বউ দেখলাম।

হাশেম চলে যাবার বছর তিনেক পরে বিয়ে করেছিল মাহবুব। কাজেই এই প্রথম দেখা।

—-ভারী লক্ষ্মী বউ পেয়েছিস।

মাহবুব মুখ নিচু করে আঙ্গুল দিয়ে চাঁদর খুঁটতে খুঁটতে শুধালো, তুমি এতদিন ছিলে কোথায়?

হাশেম হাসলো। হাসলো নাতো যেন অন্ধকারে একরাশ ফুলসৃস্টির ভ্রম হলো।

—-বাবা মা কাঁদতে কাঁদতে মরতে বসেছিলেন তোমার জন্যে।

মানুষ তো কাঁদতে জানে বলেই বেঁচে থাকে, মাহবুব। কান্নাটা হচ্ছে মানুষের একটা শক্তি। বুঝতে পারছিস?

মাহবুব নির্বাক হয়ে শোনে। হাশেম বলে, ব্যথা পেলেই কাঁদে। কান্না হচ্ছে ব্যথার রূপ। ব্যথাটাকে বুঝতে না পারলে কাঁদতে পারবি কেন? মানুষ তো এমনিতেই কাঁদে, কাঁদে না? হাত পা ছড়িয়ে আকুলি বিকুলি করে, বিচ্ছিরি সংস্কারের মতো। সংস্কারটাকে বাদ দিয়ে যে কান্না ওটাই শক্তি।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে মাহবুব। সত্যি সত্যি হাশেম যে পাগল হয়ে গিয়েছে এইটে অবিশ্বাস করবার আর কোনো কারণ সে দেখতে পায় না।

ঠিক এই কথা যখন সে ভাবছিল, তখন তাকে চমকে দিয়ে একেবারে সুস্থ মানুষের মতো হাশেম ঘরোয়া প্রসঙ্গ ওঠায়। বলে, কী করছিস আজকাল? মা চাকরির কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ।

আজ আপিস যাসনি?

ট্রেনিং-এ আছি।

মাহবুব রান্নাঘরে এসে মরিয়মকে জানাল, মা, ভাই দেখছি বদ্ধ পাগল।

চটে গেলেন মরিয়ম। বললেন, হ্যাঁবে, তোদের মুখে কি আর কোন কথা নেই? পাগলই তো! নইলে কী সব বকছে শুনে এসোগে।

মাহবুব আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল জোর দিয়ে, হঠাৎ চোখে পড়ল তার বউ ফাতেমা চোখ টিপে বারণ করছে।

আমার ছেলে পাগল আছে বেশ আছে।

বলতে বলতে মরিয়ম যেন আঁচল দিয়ে অশ্রুই মুছলেন।

বিলকিস সারা ইউনিভার্সিটিতে উৎসুক হয়ে খুঁজল আবুকে। কিন্তু কোথাও দেখা মিলল না তার। সে বাসায় না থাকাতে আবু চটে গেছে কাল। তার প্রমাণ ছোট্ট চিঠিটা। চিঠির সেই কথা—-আরেকটা তারিখ নাইবা নিলেন। চিঠি পেয়ে বিলকিস যেমন বিস্মিত হয়েছে, তেমনি মনে মনে নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছে সে। মনে হচ্ছে কাল কথা দিয়ে অমন করে না বেরুলেও পারত। কিন্তু সে তো বুঝিয়ে লিখে রেখে গিয়েছিল। কিছুতেই যেন বুঝতে পারছিল না বিলকিস, হঠাৎ করে মানুষটার গিয়ে লাগল কোথায়? তবে সে কি যা আশঙ্কা করেছিল তা–ই সত্যি? আবু তার হৃদয়কে বাসনা করছে?

বিলকিস তখন নিজের নারীত্ব নিয়ে যেন বিষ বিব্রত বোধ করল। তারপর সারাদিনে ক্লাশের চাপে আর কিছুই মনে রইল না তার। সারাটা দিন ক্লাশ করে, লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করে বাইরে যখন বেরুল তখন মনে মনে বলল—- আরেকটা দিন পার হয়ে গেল। বিকেলের রাঙ্গা রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মুগ্ধ হতে দিল বিলকিস। এই রৌদ্রটা শুধু এই সময়ের; আর কোন দিন তা ফিরে আসবে না। এক অপরূপ আনন্দ ও বেদনার আশ্রয়ে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আমগাছটার নিচে। আজ তার গাড়ি আসতে বড় দেরি হচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণ দেখে বিলকিস রিকশা নিয়ে বাড়ি ফিরল। দ্যাখে, টেবিলের ওপর চিঠি। হাতের লেখা আর স্ট্যাম্প দেখে তক্ষুণি বুঝতে পারে ফ্লোরেন্স থেকে মন্টি চিঠি লিখেছে। ইস, এর আগেও মন্টি আরেকটা চিঠি দিয়েছিল। তার উত্তর দেয়া হয়নি। নিজের

আলসেমিকে মনে মন নিন্দা করল বিলকিস। চিঠিটা তক্ষুণি খুলল না। তুলে নিয়ে রেখে দিল হাতব্যাগে।

বাথরুমে এসে মুখ মার্জনা করল। তারপর আয়নায় শাদা তোয়ালে জড়ানো মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল বিলকিস। যেন নিজের মৃতমুখ দেখছে, এমনি অপলক দৃষ্টি তার।

মন্টির মুখ অদ্ভুত রকমে রেখা ও কোণবহুল। আবছা আবছা মনে পড়ে বিলকিসের। আর রংটা গাঢ় তামাটে। দেখলে মনে হয়, একটা আবক্ষ মূর্তির দর্শন ঘটলো, বিশেষ করে মন্টি যখন চোখ বুজে থাকত। কথ বলতে বলতে অনেকক্ষণ চোখ বুজে থাকা, চোখ বুজেই কথা বলা মন্টির একটা স্বভাব। বিলকিসের মনে হতো তখন, মন্টি যেন চোখ বুজে দেখে নিচ্ছে যা বলছে। মন্টি বলত, পৃথিবীটার কোনো হারমনি নেই, বিলকিস। প্যাটার্ণ নেই, প্রাণ নেই। চান্স ইরেকটেড, চান্স ডাইরেকটেড। দেখে দেখে আমার গা জ্বালা করে। তাই তো ছবি আঁকি। চারটা ফ্রেমের মধ্যে যে পৃথিবী সৃষ্টি করলাম, তার ভেতরে বস্তুর প্রাণের হারমনি আছে, এইটে বড় কথা।

বিলকিসের অনেক দিন মনে হয়েছে, মন্টির চোখ বুজে থাকার অভ্যেসটা এখান থেকেই পাওয়া। এ যেন বাইরের পৃথিবী থেকে চট করে সুইচ অফ করে তার নিজের পৃথিবীতে চলে যাওয়া।

বেরিয়ে এসে বিলকিস বারান্দায় মোড়া পেতে বসল। শিশু সন্ধ্যের আভাস লেগেছে আকাশে। চারদিক ভারী শান্ত। মোড়ায় বসেই চা খেলো।

তারপর হাঁটল খানিক নিচেয় ঘাসের ওপর। ফিরে এসে ছোট বোন পারিজাতের সঙ্গে আদর খেলা করল। ছোট ভাগ্নে দুটো এসেছে কাল। টুকু আর টুলু। তারা তখন ভাঙ্গা চক দিয়ে মেঝেয় সোৎসাহে পাখি আঁকছে আর ছড়া কাটছে—-

দ গেলো শ্বশুর বাড়ি
বসতে দিল কাঠের পিড়ি।

তাদের কোল সাপটা করে নিয়ে সোফার ওপর বসল বিলকিস। গাল টিপে দিয়ে বলল, লক্ষ্মীছাড়া হয়েছিস দুটো।

তখন খিলখিল করে হাসতে হাসতে টুকু নেমে এলে বিলকিসের পায়ের ওপর। সেখানে বসে সে দোল খাবার চেষ্টা করতে লাগল। আর টুবলুও কিছু কম যায় না। সে বাহুর ফাঁক দিয়ে একেবারে কাঁধের ওপর উঠে বাতাসে সাঁতার দিতে লাগল।

টুকু আর টুবলুকে নিয়ে কাটানো গেল অনেকক্ষণ। তারপর নিজের ঘরে এসে মন্টির চিঠিখানা খুলে পড়তে বসলো। প্রথমেই লম্বা এক অভিযোগ!

আগের চিঠিটার জবাব দাওনি কেন? তোমার চিঠির জন্যে তাকিয়ে থেকে থেকে ঘাড় ব্যথা। করতে শুরু করে দিয়েছে। ডাকপিয়নটার কাছে পর্যন্ত লজ্জা পাচ্ছি। ওর সাইকেলটা মোড়ের মুখে দেখলেই এখন আমি পালাই।

বড্ড নিষ্ঠুর হয়েছ তুমি।

অথচ এদিকে তোমাকে নিয়ে কত কাণ্ড! আমার বন্ধু অগাস্টাস—- সেই যে ছেলেটা, যার কথা এর আগে তোমার কাছে লিখেছিলাম, একটা সোলো একজিবিশন করে ক্রিটিকদের কাছে। দারুণ বকা খেলো সেই অগাস্টাস এক কাণ্ডই করে বসেছে। আমার কাছ থেকে ফোটো নিয়ে তোমার ছবি এঁকেছে। নাম দিয়েছে দ বু ক্লাউড অ্যাণ্ড সেভেন্টি নাইন। অদ্ভুত এই নামটার একটা মজার ব্যাখ্যা আছে।

এবার হাতে টাকা এলেই অগাস্টাস তোমার কাছে ছবিটা পাঠাবে। ওর ছবি কেউ কিনতেই চায় না! যা বিক্রি হয় তাতে ওর কালো রুটি, মদ আর বাড়িউলিকে ভাড়া দেয়ার পয়সা হয় কোনো রকমে। তাই ভাবছি, ছবিটা শেষ অবধি তোমার কাছে পৌঁছুবে কিনা। ওকে বললাম, ছবির অন্তত একটা ফোটো তুলে পাঠাই।

তাতে চটে গিয়ে বলল, আড়াই বাই চার ইঞ্চি এক চিলতে কাগজে শাদা কালোয় আমার ছবির কংকালটাই পাবে।

লুসিয়েন কিন্তু অগাস্টাসকে ভোগাচ্ছে খুব। মেয়েটা যেন ওকে মানুষ বলেই গনতে চায় না। অগাস্টাসের এই হাল দেখে একেক সময় লুসিয়েনের ওপর এত চটে যাই যে তখন হাত নিসপিস করতে থাকে। মনে হয়, কী হয় পৃথিবীর, এই মেয়ে জাতটা না থাকলে?

তুমি ভাবছ, আমার মানসিক অধঃপতন দেখা দিয়েছে। না, না। অগাস্টাসকে দেখলে রাস্তার ষ্ট্যাচুটার পর্যন্ত দুঃখ হতো, আর আমি তো জ্যান্ত মানুষ! অথচ ছেলেটা এমন, বাইরে কিছু বলবে না, ভেতরে ভেতরে যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সে ছাই সোনার পাত্র দিয়ে ঢেকে রাখবে। আমি বলি, লুসিয়েন একদিক থেকে ভালোই করছে অগাস্টাসের। নইলে ওর ছবি আঁকাই হতো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেমন করে ছবি এঁকে চলে, দেখলে অবাক হতে হয়। শক্তি পায় কোত্থেকে? আমি বলি—-লুসিয়েন।

দ্যাখো কী কাণ্ড! একটু আগে লুসিয়েনের সূত্র ধরে তামাম মেয়ে জাতটাকে মন্দ বলছিলাম। এখন আবার তারই সুখ্যাতি করছি।

কলম তুলে ভাবলাম খানিক, কেন এমন হলো?

মনে হচ্ছে, একবার ব্যক্তি হিসেবে একবার শিল্পী হিসেবে দুরকম করে অগাস্টাসকে দেখছি বলেই এই গরমিল। কোনটাকে বড় করে দেখব? কী জানো বিলকিস, শেষ অবধি হয়ত মানুষটাকে বড় করে দেখা উচিত। মানুষটাই যদি কষ্ট পেল তাহলে এত হৈচৈ আয়োজন কার জন্যে? নামের মোহ যাদের আছে তাদের আলাদা কথা। তারা পেলেও যা, না পেলেও সেই একই। কিন্তু নামের মোহ যাদের নেই?

মানুষ বাঁচে বলেই তো পৃথিবীটা বাঁচে। যে মানুষ আজ মরে গেল, তার কাছে এ পৃথিবীর শিল্প সভ্যতা সুখ–দুঃখ সব কিছুই মরে গেল।

যতটুকু বেঁচে আছি, আনন্দ থাক। তাইতো বারবার তোমাকে বলি, আমাকে আর দূরে সরিয়ে রেখো না।

তোমার অন্তরটাকে আমার আপন করে নিতে দাও, যেন মৃত্যুর সময় আমাকে দুঃখ করতে না হয়।

কথায় কথায় কতদূর চলে এসেছি!

অগাস্টাস কাল ভোর রাতে আমাকে বেদম মার দিয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত ছুটছিল। কাল সন্ধ্যেয় লুসিয়েনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। ও এসেই বলল, আজ তোমার সঙ্গে আমার তারিখ।

আমি তোমার কথা মনে করে বললাম, আমার তারিখ তো হয়ে আছে, লুসিয়েন।

সে বলল, কুছ পরোয়া নেহী! তোমরা অমন একরোখা প্রেমিক কেন, মন্টি? আজ আমি তোমার মেয়েটার কাছ থেকে একটা দিন ছিনিয়ে নিতে এসেছি। ঠিকানা দিও, তাকে না হয় ফুল পাঠিয়ে ভাব করে নেবো পরে।

কী ভাবছ বিলকিস? ভাবছ, তোমার কথা দশখানা করে বলে বেড়িয়েছি সারা ফেলরেন্স? ভরসা আছে, তা যদি বলেই থাকি তুমি চটে যাবে না। আর এক্ষেত্রে বলিইনি। লুসিয়েনের আন্দাজ ভালো।

গলায় লুসিয়েনের হাত। তোমার কাছে স্বীকার করতে সংকোচ নেই, তখন আমার একটু ঘোর লেগেছিল যেন। নইলে পরক্ষণেই লুসিয়েনকে নিয়ে হৈচৈ করে বেড়িয়ে পড়লাম কেন?

দ্যাখো, অভিমান করতে যেও না যেন, লক্ষ্মী। আমি বলছি বলেই তো জানতে পারছ, নইলে জানতেও না। কথা দাও, আমাকে ভুল বুঝবে না। নইলে এই আমি কলম বন্ধ করলাম।

জানি, তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। আমি তো জানিই, তোমার কাছে প্রশ্রয় আছে সব কিছুর।

তারপর রাতে ঘরে ফিরে লুসিয়েনের ছবি করতে বসেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, এই ছবিটা আঁকতে না পারলে লুসিয়েন থেকে যেন আমার নিস্তার নেই। রাত তখন অনেক। লুসিয়েনের পোরট্রেট করছি। শাড়ি পরা লুসিয়েন। দূরে টুলের ওপর পরিতৃপ্ত পোষমানা বেড়ালের মত এতক্ষণ বসে ছিল লুসিয়েন।

ক্যানভাসে শাড়ির রেখা দেখে ও শুধালো, ওকী! কেন?

আমি বললাম, মাথার ভেতরে অনেক কিছু ওভারল্যাপ করছে। তুমি কথা বলো না। পোরট্রেটটা তুমি নও, ওটা আমার এক্সপ্রেশন বা ইম্প্রেশন যা বলো।

এত দ্রুত শেষ করেছিলাম ছবিটা যে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেরই অবাক লাগলো। লুসিয়েন কাঁধ ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আর সব পেইন্টারদের তুলনায় তুমি অনেক বেশি সহৃদয়। মোটেই সময় নাওনি।

আমি দাঁড়িয়ে নিরিখ করছিলাম সদ্য আঁকা ছবিটাকে। ছবিটার ডোমিন্যান্ট রং ছিল গ্রীন। গ্রীনটার স্বরূপ তোমাকে লিখে বোঝাতে পারব না।

লুসিয়েন তার বুক আমার পিঠে ঠেকিয়ে আদুরে মেয়ের মত কাঁধে মাথা রেখে ছবিটা দেখছিল। ঠিক এই সময় ভূতের মতো অগাস্টাস এসে হাজির। ভেবে দ্যাখো বিলকিস, একেবারে অপেরা থেকে কেটে আনা একটা দৃশ্য! অগাস্টাস কিছু বলল না। এক মুহূর্ত একবার আমাকে দেখল, একবার লুসিয়েনকে। আমি তো মনে করলাম, অগাস্টাস আমার ছবিখানা ইজেল শুদ্ধ তেতলা থেকে ছুঁড়ে মারবে। বদলে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। অগাস্টাসের হাতে রং লেগে ছিল। ছবি আঁকছিল বোধ হয়, ফেলে রেখে উঠে এসেছে। এ রকম অনেক দিন এসেছে ও আমার ঘরে দুপুর রাতে আধ মাইল পথ হাঁটতে হাঁটতে। ওর জন্যে আমাকে মদ কিনে রাখতে হতো। আজ ওবও দুর্ভাগ্য। আমারও। পড়ে। পড়ে মার খেলাম পশুর মত। কিডনিতে একটা ঘুষি পড়েছিল বেকায়দায়, ব্যথাটা এখনো যায়নি। উলটে মারতে পারতাম, মারিনি। ভাবলাম, ও ওর পাত্র পান করুক প্রাণ ভরে।

অগাস্টাস চলে গেলে পর লুসিয়েন এসে আমার পাশে মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসল। আমার রক্ত দেখে অগাস্টাসের উদ্দেশে থুতু ছিটিয়ে বলল, ক্রাইস্ট। একটা পশু।

ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে এসেছিল লুসিয়েন। তাকে ফিরিয়ে দিলাম। সে রাগ করে চলে গেল। সকালের দিকে জ্বর এসেছিল। এখন নেই। বিছানাতেই আছি। হঠাৎ দুপুর বেলায় অগাস্টাস এসে একটা কথা না বলে আমার শুশ্রূষা করছে আনাড়ির মতো। বেচারা লজ্জা ঢাকবার জন্যে তখন থেকে গম্ভীর। দেখে হাসি পাচ্ছে।

দেখলে বিলকিস, অগাস্টাসের কাণ্ডটা?

এখন অনেকটা সুস্থ আছি।

আর কী লিখি? ভালো কথা, অগাস্টাস তোমার যে ছবি এঁকেছিল তার নাম দি বু ক্লাউড অ্যাণ্ড সেভেন্ডি নাইন কেন বলাই হলো না। ফেলরেন্সে এসে ও প্রথমে যে বাড়িটায় উঠেছিল। তার নম্বর ছিল উনআশি। কবে ছেড়ে দিয়েছে বাড়িটা, কিন্তু এখনো নাকি হোমসিক হলে তার গায়ের বাড়ির কথা মনে না হয়ে মনে পড়ে ফেলরেন্সের এই উনআশি নম্বর বাড়িটার কথা। অগাস্টাস বলে, এ হচ্ছে মনের এক অদ্ভুত খেলা। তা সেই থেকে প্রিয়তম যা কিছু। তারই প্রতীক ওর কাছে উনআশি। আব নীল মেঘ? তার ব্যাখ্যা ছবিতে, ছবি না দেখলে শুধু লিখে বোঝানো যাবে না।

অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে চিঠিটা, তাই না? তুমি এবারো যদি জবাব না দাও তাহলে সাংঘাতিক একটা কিছু করে বসবো। দাড়ি কামাতে গিয়ে গলায় ক্ষুর টেনে দিলে কেমন হয়?

আর নদিন পর আমার জন্মদিন। তোমার হয়ত মনেও পড়ত না আমি না লিখলে।

ভালো থেকো কিন্তু। নইলে ভীষণ রাগ করবো। আর তোমার পরীক্ষাটা কবে নাগাদ জানিও। তখন চিঠি লিখে জ্বালাতন করব না। কিন্তু ইতিমধ্যে চিঠি দিও।

তোমার চিঠি পাবার জন্যে নিজের ব্যাকুলতা দেখে হঠাৎ হাসি পাচ্ছে। গোটা মানুষটার জন্যেই যখন প্রতীক্ষা করছি, তখন একটা চিঠির জন্যেই এত! চিঠি না পাওয়াটাই এত অসহনীয়, তোমাকে না পেলে কী করব? এখান থেকে ভূমধ্যসাগর কিন্তু দূরে নয়। ডুবে মরা যাবে। অগাস্টাস তখন তোমার ছবির নাম বদলে হয়ত রাখবে দি বু সি অ্যান্ড সেভেন্টি নাইন।

ভালবাসা।
ইতি, তোমার মন্টি।

চিঠি শেষ করতেই আবুর কথা মনে পড়লো। চিঠি পড়তে পড়তে মন্টির মধ্যে তন্ময় হয়ে থাকার পর্দা ছিঁড়ে আবুর মুখ কেন ভেসে উঠল ভেবে পেল না বিলকিস। মনের মধ্যে মোচড় ওঠে, আবুর জন্যে কিছু করা দরকার। কিন্তু কতটুকুইবা তার ক্ষমতা?

কালকে চিরকুটে লেখা আবুর ওই কথাটা আরেকটা তারিখ নাইবা নিলেন—- একেবারে মর্মে এসে নাড়া দিয়েছে তাকে। এতকাল যা ছিল আড়ালে তার স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে বিব্রত করে দিয়ে গেছে বিলকিসকে। তা হাত পা বাঁধা। আবুর জন্যে মমতা হয়, কিন্তু হাত ওঠাতে গেলে যে টান পড়ে; মন্টি তার সর্বস্ব নিয়ে এত ভরসা করে আছে। বিলকিসের মনের ভেতরটা খুব অসুখী হয়ে থাকে। জগৎ জোড়া একী নির্মম পরিহাস! লুসিয়েন অগাস্টাস এদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, লুসিয়েন তার বিরাগ দিয়ে শক্তি জোগাচ্ছে অগাস্টাসের। বিলকিস ভাবে তার বিরাগেও কি শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে না আবু

.

আবুকে অনেক কিছু করতে হবে। অনেক বড় হতে হবে। অমন সংবেদী ছেলেটা ইচ্ছে করলে অনেক বড় হতে পারে। বিলকিসের মনে হয়, তার যদি কোন অলৌকিক শক্তি থাকত তাহলে এই মুহূর্তে আবুকে পৃথিবীর সবসেরা মানুষ করে দিত।

রাতে চিঠির জবাব লিখতে বসলো বিলকিস। লিখবার আগে আরো দুবার পড়ল চিঠিটা; যেন যথেষ্ট করে অনুভব করে নিল মন্টিকে। বারোয়ারি কথায় ঠাসা জবাব। লুসিয়েনকে বকলো খানিক অগাস্টাসকে ভোগাবার জন্যে। অগাস্টাসের জন্যে দুঃখ করল তার ছবি বিক্রি হয় না বলে। লিখল, সেদিন ভোর রাতে অগাস্টাস মারপিট করে ভালই করেছে,

নইলে। নিজেরই ওপরে প্রতিশোধ নিত। সেটা হতো আরো ভীষণ। মন্টি তার ঝড় আগলে সুবুদ্ধির পরিচয়ই দিয়েছে।

লিখল, এখানে আবু নামে তার এক বন্ধুর কথা। লিখল, এমন একেকটা লোক থাকে যারা অচেনাও থাকে না, আবার যাদের চেনাও যায় না। তারা সর্বমানুষের অনাত্মীয় হয়ে থাকার জন্যেই যেন এ পৃথিবীতে জেদ করে বেঁচে আছে। পরে লিখল দেশের খবর আর আবহাওয়ার কথা।

এতক্ষণ চিঠি থেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে এসেছে নিজের কথা। চিঠির সবশেষে ছোট্ট করে বিলকিস লিখল

খুব যে ভয় দেখাচ্ছ আমাকে! তোমাকে এ রকম বিচলিত হতে দেখলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারিনে।

পারবে আমার মতো জেদি, স্পষ্ট, শাদা একটা মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটাতে?

তোমার জন্মদিন আমার মনে ছিল। ওই দিনটা আমার কাটবে ছুটি নিয়ে; তোমার কথা মনে করে।

.

বকুলের ঠিকানা চেয়েছে হাশেম। কিন্তু আবু কোথায় খুঁজবে বকুলকে? সেগুন বাগানের। প্রতিটি বাড়ি? রেস্তোরাঁয় দুপুরে অনেকক্ষণ ধরে একটা পথ আবিষ্কারের ভাবনা ভাবল। কিন্তু কোন ফল হলো না। আজ দুদিন হলো আবু শুধু ভাবছেই। এতদিন পরে বকুলকে কী দরকার? ভাবতে থাকে আবু। যাকে ভালবেসেছিল হাশেম, পাঁচ বছর আগেই তো তাকে কবর দিয়ে চলে গিয়েছিল। আজ ফিরে এসেছে কবর থেকে মৃতমুখ তুলে দেখবার জন্যে? হাশেম ভাইয়ের ব্যাকুল মুখের কথা মনে করে আবু ভীষণ অস্থিরতায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে থাকে মুঠি বন্ধ করে। একটা কিছু করা দরকার। খামোকা একটা শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিস দেখতে থাকে আবু। দেখে না, চোখটাকে একটা কিছুতে স্থির রাখা চলে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। হঠাৎ রেস্তোরাঁয় ফিরে এসে টেলিফোন করে বিলকিসকে।

বিলকিস?

হ্যাঁ বলছি।

আমি আবু।

কী ব্যাপার?

বিলকিসের বুকের ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে যায়। এই ভরদুপুরে আবু হঠাৎ টেলিফোন করল কেন? উদ্বেগ নিয়ে টেলিফোনের উপর ঝুঁকে পড়ে বিলকিস। কিন্তু অনেকক্ষণ কোন উত্তর আসে না। আবারো সে শুধোয়, হ্যালো, কী ব্যাপার?

তখন আর বলে, আমার একটা কাজ করে দিতে পারবেন?

কী কাজ?

প্রায় আর্তনাদের মত শোনায় বিলকিসের কণ্ঠ।

আবু বলে, কিছু না। একটা ঠিক না দরকার, খুঁজে দিতে হবে।

ঠিকানা?

হ্যাঁ, ঠিকানা। বকুল। প্রায় পাঁচ বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। বিয়ে হয়েছে। সেগুন বাগানে না কোথায় আছে শুনেছিলাম। বড় দরকার। পারবেন? আজ-কালের মধ্যেই দরকার।

আবুর কণ্ঠের ব্যাকুলতা টের পেয়ে বিলকিস যেন অবাক হয়, তেমনি তার জন্যে কিছু একটা করতে পারার সম্ভাবনায় আগ্রহে ভরে ওঠে। নিশ্বাস ফেলে বলে, হ্যালো, আমি নিশ্চয় দেখব।

কষ্ট দিলাম।

না, না। আপনি কাল একবার খোঁজ নেবেন। কেমন?

আমেনা আবছা অবাক হলেন আবুকে দেখে। বীথিকে নিয়ে হঠাৎ আবার কিছু হলো নাকি? বীথির বাবার চিঠিটা পাবার পর থেকে তিনি বড় চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত আছেন। উদ্বিগ্ন গলায়। শুধোলেন, এই ভরদুপুরে? মুখটা যে একেবারে তেতে উঠেছে।

আবু ম্লান হেসে বলল, এইতো, এলাম।

বিলকিসের কাছে টেলিফোন করে ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়।

ইউনিভার্সিটি বন্ধ। বাসায় ফিরে যাবে, যেত, যদি বীথি ও রকম পাথরের মতো বসে না থাকত। বড় চাচিমার কাছে অনেকদিন আসা হয়নি, মনে মনে ভাবল আবু। ছেলেপুলে নেই। এলে কত খুশি হন। আমেনা শুধোলেন, হাশেম কেমন আছে?

ওই রকমই। তুমি আর দেখতে গেলে না যে?

যাবো কী, বাতের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি, বাবা। এক পা নড়বার যো নেই।

আমেনা নিরিখ করতে থাকেন আবুকে। ভাবেন বীথির বাবা যা লিখেছেন তা কী সত্যি? কথাটা কি তিনি জিজ্ঞেস করবেন আবুকে? কিন্তু মুখে বলেন, হাশেম কিছু বলে কোথায় ছিল?

বলে, মানুষ দেখতে বেরিয়েছিলাম।

ওমা, সে কিরে?

আবু হাসল। হাসতে হাসতে বলল, ও সব তুমি বুঝবে না। বাবা, মা, এমন কী বড় চাচা অবধি হাঁ হয়ে গেল হাশেম ভাইয়ের কথা শুনে।

আমেনা সংশয়ে দুলতে দুলতে বললেন, তাহলে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে।

প্রলাপ! একেবারে ভাল মানুষের মতো, চাচিমা। চলো, নিজে শুনে আসবে। তখন দেখব। কার কথা ঠিক।

আবু একটা ছোট্ট ছেলের মতো করতে থাকে। বড় চাচিমা ভীষণ আদর করেন তাকে। যাহ, তুই বাড়িয়ে বলছিস, হিংসুটে। কই তোর চাচাতো কিছু বললেন না।

বেশ। বলে নি তো বলে নি। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

ভাত খাবি?

কী মাছ?

ভালো মাছ নেইরে। একটা ডিম করে দি?

দাও।

৫. খাবার সাজাতে সাজাতে আমেনা

খাবার সাজাতে সাজাতে আমেনা আবার বীথির বাবার চিঠিটা মনে করেন। বীথির বাবা লিখেছেন, বীথিকে আপনার কাছে এনে কিছুদিনের জন্যে রেখে দিন।

প্রস্তাবটা পেয়ে একদিকে যেমন কষ্ট হয়েছে, তেমনি খুশি লেগেছে আমেনার। হোক না কয়েকদিনের জন্যে তবু তো বীথি থাকবে তার কাছে। তার নিজের মেয়ে হলে এতদিনে। বীথির মতোই বড় হত। কিন্তু আবুর সাথে মেয়েটার যদি সত্যি সত্যি ভাব হয়ে থাকে তো আবু কষ্ট পাবে। আমেনার কষ্টটা সেইখানে।

পরে তিনি মনে মনে একটা সমঝোতায় এসেছেন। বীথি তো আর তেমন দূরে রইল না, পরের ঘরেও রইল না। আবু আসবে যখন খুশি। বরং আবু-বীথি, তখন দুজনকেই পাওয়া যাবে চোখের সমুখে।

ভাবলেন আবু হয়ত ইতিমধ্যেই শুনেছে বীথিকে নিয়ে আসা হচ্ছে এখানে, তাই আগে থেকে নিজেই পা বাড়িয়েছে তার দুয়ারে। নইলে কোনদিন আসে না এ সময়ে, এই ভরদুপুরে আজ আসবে কেন? এসেছে, পরে যেন সময়ে অসময়ে এলে অবাক না হন তিনি। ভাবতে ভাবতে আমেনার মুখে মধুর হাসি দেখা দিল।

আবু খেতে বসলে আমেনাও তার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। দেখলেন আবুর গোগ্রাসে খাওয়া। একটু মন্দা পরলে শুধোলেন, কী সব শুনি, আবু?

আবু চোখ তুলে তাকাল। বুঝতে পারল না।

কী?

বলতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন আমেনা। বড় জোর বলতে পারলেন, ঐ আর কী!

আবু এবারে অবাক হয়ে গেল। বড় চাচিমার কথায় সম্পূর্ণ একটা নতুন সুর বাজছে।

গ্লাসে পানি ভরে দিতে দিতে তিনি বললেন, হ্যাঁরে, তুই নাকি বীথিকে বিয়ে করবি?

কাকে?

আহা, বীথি। শুনছি, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

আবু আমেনার দিকে একটুখন তাকিয়ে থেকে হাত ধুতে ধুতে বলল, ঠাট্টা করছ কিনা বুঝতে পারলাম না।

ওই তোর খাওয়া হলো?

তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে আবু তার চেয়ার আমেনার মুখোমুখি নিয়ে বসল। বলল, হয়েছে। তুমি ঠাট্টা করছ বলে খাওয়া নিয়ে আমিও ঠাট্টা করব নাকি? আমার বেশ খিদে পেয়েছিল।

আমেনা রাগ করলেন শুনে।

তোর সাথে ঠাট্টা করবার আর কথা পেলাম না?

আবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝতে পারল। বলল, তোমাদের সব হয়েছে কী? সেদিন সন্ধ্যায় মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ৰাথি কোথায়? আমাকে অবাক করে দিয়ে উত্তর দিলেন—-

ওকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? মাতামাতি কিসের, চাচিমা? কেন, বীথির আমি কী করেছি?

তবে কি ওরা এমনি বলে?

কে কী বলে না বলে তা আমি জানব কী করে?

বীথির সঙ্গে বেড়াতে যাস না তুই?

যাই।

ওর ঘরে যাস?

যাই।

যাবার একটা সময় আছে।

বীথির কাছে আমার আবার সময় বুঝে যেতে হবে নাকি?

কথাটার অন্য মানে বুঝলেন আমেনা। বললেন, তবে যে বললি ওর সঙ্গে ভাব নেই!

বেশ তো বীথিকেই জিজ্ঞেস করে দেখো। ওর সঙ্গে কী আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না?

এটা একটা সম্পর্কের ছিরি হলো, আবু?

রাগ করে উঠে দাঁড়ায় আবু।

চললি?

যাবো নাতো কী!

.

দুপুর থেকে জ্বরটা নেই হাশেমের। মাথায় বালতি বালতি পানি ঢালার পর এই এতক্ষণে চোখের লালটা কমেছে। মরিয়ম ছেলের মাথা মুছিয়ে দিয়ে তোয়ালে নিঙড়ে রাখলেন।

হাশেম শুধাল, বীথি কই, মা?

এইতো এতক্ষণ ছিল তোর কাছেই, লক্ষ করিসনি। ওর শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না, ঘরে গেছে।

হাশেম উদ্বিগ্ন হলো।

কেন, কী হয়েছে?

কিছু না।

মরিয়মের বাঁ হাতে রয়েছে হাশেমের মুখ। তিনি সিথি করিয়ে দিচ্ছেন আস্তে আস্তে। মরিয়মের মন বীথি চলে যাবে শুনে অবধি খারাপ হয়ে আছে। তার ওপরে সে রাতে

বীথির জড়িয়ে ধরে অমন কান্না তাঁকে আরো দুর্বল করে দিয়ে গেছে যেন। নিয়ে যাওয়ার কথা। শুনলে বীথি কষ্ট পাবে, এটা তার চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না।

মায়ের হাত থেকে সরে এসে হাশেম বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজতে খুঁজতে বলে, ওকে একা থাকতে দিও না, মা। একা থাকলে ও মরে যাবে। তুমি ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে পারো না?

দেখিরে দেখি।

জানো মা, ওই তোমাদের অসুবিধে। মানুষের অন্তরটা হচ্ছে একটা আলাদা পৃথিবী। মানুষটার নিজস্ব পৃথিবী। তোমারই পেটে ধরা ছেলে, অথচ তার বুকের ভেতরে কী আছে। জানতে পারো? কেউ কি কারো কথা জানতে পারে? বার থেকে আবছা আবছা শুধু অনুভব করা যায়। বীথিকে জানবে কী করে? সেদিন প্রথম দেখলাম। দেখে যেন আমার নিজেরই ভয় করল।

দরোজায় দাঁড়িয়ে বীথি।

মরিয়ম বললেন, তুই আবার উঠে এলি?

হাশেম চোখ মেলে দেখে। হাত বাড়িয়ে দেয়।

আয়, বীথি। জ্বরটা তুই কমিয়েই দিলি।

মরিয়ম খুশি হয়ে ওঠেন।

এখন ভালো লাগছে, বাবা?

হ্যাঁ।

বলে হাশেম ম্লান হাসে। আবার সেই সুন্দর হাসিটা।

বীথি তখন তার শিয়রে বসে কপালে হাত রাখে। হাশেম বলে, এলি কেন? মা বলছিলেন তোর শরীর খারাপ। তুইও মরবি নাকি, বীথি?

.

সন্ধ্যের আগে দিয়ে হাশেমকে হাঁটতে দেখে সবাই অবাক হলো। এই দুপুরেও দাঁড়াতে পারছিল না। মরিয়ম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

উঠলি কেন, হাশেম?

হাশেমের যেন তা কানেই যায় না। লম্বা লম্বা পা ফেলে কেমন অদ্ভুতভাবে হাঁটতে থাকে বারান্দা দিয়ে।

মরিয়ম তখন একেবারে তার কাছ বরাবর উঠে আসেন। তিরস্কার করে বলেন, তুই আমাকে জ্বালাতেই এলি, হাশেম। পড়ে গিয়ে মাথা ফাটাবি নাকি?

হাশেম মায়ের কাঁধে হাত রেখে বলে, বড়ড ভীতু তুমি। বলেছি না, শরীরটা এতকাল চোখ বুজে থেকে এখন শোধ নিচ্ছে। শরীরটা যা খুশি করছে, আমি তাই বলে বসে থাকব নাকি? আমাকে হাঁটতে দাও, মা।

মরিয়ম তখন ঘরে এসে বীথিকে পাঠিয়ে দেন তার সঙ্গে থাকবার জন্যে।

হাশেম ততক্ষণে নেমে গেছে রাস্তায়।

রাস্তাটা বিকেলের আভায় শান্ত হয়ে আছে। দুধারের বাসাগুলো আড়াল পড়েছে সুন্দর করে ছাটা দেয়াল-গাছে। বাঁধানো নিকানো চত্বরের মতো ভ্রম সৃষ্টি করছে রাস্তায় পীচ।

বীথিকে দেখে হাশেম বলল, মা পাঠিয়ে দিলেন বুঝি? বেশ তো আয়, দুজনে মিলে বেড়ানো যাক।

হাশেম বীথিকে পেয়ে আশ্বস্ত হলো। এই মুহূর্তে কথা বলার একটি লোক দরকার। মাথার মধ্যে কথারা তখন থেকে জোট পাকাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ হাঁটবার পর বীথি হঠাৎ শুধোয়, তুমি অমন করো কেন, হাশেম ভাই?

হাশেম মুখ উজ্জ্বল করে হাসে।

কী করি রে?

বীথি এই কটা দিনে হাশেমকে নিজের এত কাছে মনে করতে পেরেছে যে, সেই কথা জিগ্যেস করতে আর কোন বাধা নেই। বকুলের কথা ভাবতে থাকে বীথি। মুখে বলে, আর কেউ হলে বিছানা থেকে উঠতে পারত না।

আচমকা উত্তর আসে হাশেমের কাছে থেকে, তুই নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারিস না?

কম্পিত কণ্ঠে বীথি বলে, না, কই?

পরে বলে, একটু একটু পারি।

হাশেম তখন আবার হাসে। বীথির কাঁধে হাত রেখে সন্ধ্যের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, বীথি, এ হচ্ছে একটা বন্ধন। তোর মানব-জন্মের মাশুল। দ্যাখ, আমি ধর্ম মানিনে, আমি কেবল একটা জিনিসেরই দাম দিই—-যাকে আলোকিত আত্মা বলি।

বীথি শুধোয়, বুঝতে পারলাম না কিন্তু।

হাশেম তখন বিশদ করে বলতে চেষ্টা করে, ভাল থেকে মন্দটা চিনে নেবার ক্ষমতা অর্জন। করা চাই, বীথি। এর কথাই বলছি, মানুষের জন্ম থেকে ঐ একটিই সাধনা। আর সব তো তার কাজ নয়, কাজের নামে ফাঁকি। বলেছি, ধর্ম মানিনে, তাহলে আমার বিশ্বাস কিসে? বিশ্বাস আমার তোর সবার অন্তরের পরে, বীথি। মনটাকে প্রথমে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। একবার শিক্ষা শেষ হলে তার আর ভয় নেই। তখন মনের নির্দেশে সে যা কিছু করতে পারে, যা করবে সব ভাল।

বীথি বলে, দেশ শুদ্ধ মানুষকে কি এই বুঝিয়ে এলে, যে ওপরে কেউ নেই?

তা কেন? ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে এতকাল যা শুনেছিস, সব মিথ্যে। তিনি আমার অপরাধের জন্যে দোজখে নেবেন না, পুণ্যের জন্যে বেহেশতের ডবল মালা গলায় পরিয়ে দেবেন না। আমরা সবাই তাঁর স্বর্গের আনন্দের অংশ। কিন্তু মানুষ তো? তাই পৃথিবীতে স্বর্গ সৃষ্টি করতে গিয়ে কেউ যদি অনাসৃষ্টি করে বসি তো তিনি ব্যথিত হন, শাস্তি দেন না, দিতে পারেনই না। সেইজন্যে তো বলি, বিশ্বাসকে বড় করে তোল। কী করে?

হাশেম এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল।

সবার মতো তুইও প্রশ্নটা করলি। ওইখানেই সবাই ভুল করে আমার কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়। আমি নিজেই যে ভুগছি এইটে কেউ বুঝলো না, সাধু মনে করে সবাই পা জাড়িয়ে ধরলো। পাঁচটা বছর আমি স্থির থাকতে পারিনি রে।

বীথি মনে মনে হাশেমের কথাগুলো নিয়ে ভীষণ ভাবতে থাকে।

ভালোবাসতে শেখ, বীথি। খুব বড় করে ভালোবাসা। মানুষের সবচেয়ে বিচ্ছিরি, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর বৃত্তি ওইটে। যে স্বর্গে যাবার জন্যে মানুষের মাথা কুটে মরা, সেতো এই ভালোবাসারই রূপসৃষ্টি। এর পেছনে পরিকল্পনাটা দেখেছিস ঈশ্বরের? মানুষকে তিনি হাড় মাংসের ভেতরে এমন একা করে রেখেছেন যে, তাকে বেরুবার জন্যে সাধনা করতেই হবে। আত্মার এই বেরিয়ে আসা, এর নামই তো ভালোবাসা। কিন্তু এত যে বলছি, বোঝাতে পারব না তবু। নিজের রক্ত দিয়ে বুঝতে হয়।

বীথির কেমন ভয় করতে থাকে হাশেমের কথা শুনে। হাশেম কথা বলতে বলতে তাকে পেছনে ফেলে আপনমনেই হাঁটছে। নিজের মধ্যে আবার ডুবে গেছে লোকটা। বীথির দিকে যেন তার দৃষ্টিই নেই।

বীথি জোরে পা ফেলে তার সঙ্গ নিলে, হাশেম মুখ ফিরিয়ে বলে, ইস্, জীবনে এত অসংগতি, বীথি। মাহবুব এসেছিল না? ওর কথাই ধর। ইতিহাসে এম,এ, পড়ে ফার্স্ট ক্লাস পেল। কিন্তু কাজ নিল কী? কেরানির। যার সঙ্গে ইতিহাস জানার কোনো সম্পর্কই নেই। এখন আবার। দাঁড়িয়েছে প্যারেডের মাঠে। একটার সঙ্গে আরেকটার এত গরমিল যে দিনভোর হো হো করে হাসলেও তোর হাসি ফুরোবে না। তবু কি মাহবুব বুঝতে পারে? আসলে যে কাজ ওর। করার কথা তা হয়ত এ তিনটের একটাও না। অথচ বেশ আছে।

মাহবুবকে হঠাৎ নতুন আলোয় দেখতে পায় বীথি। বলে, হয়ত তাই।

হাশেম বলে, একী শুধু তার একার? সবার। মানুষের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, সে নিজের সাফাই চমৎকার সৃষ্টি করতে পারে। বড় বিচ্ছিরি ক্ষমতা। তাই আসলে যেখানে মানুষ মরে আছে, সেখানে সে ভাবে বেঁচে আছে। বেঁচে কজন থাকতে পারে, বীথি?

প্রশ্নটা করে নিজেই তার উত্তর ভাবতে থাকে হাশেম। পরে বলে, এত যে বকে চলেছি, রাস্তার মানুষ শুনলে মনে করবে, আমি পাগল। মনে করবে, পৃথিবীতে যুদ্ধ, খাদ্য বলে কোনো সমস্যাই নেই। তা কেন? বরং বাইরে থেকে এগুলোই তো প্রবল। কিন্তু ভেতরে? মানুষের আত্মার ভেতরে এত অরাজকতা, শূন্যতা চলছে যে তার একটা বিহিত না করলে। কী হবে ভেবে দেখেছিস? ভেতরের ফাঁকিটা ভরাবার জন্যে মানুষ নিজের সঙ্গে কেবলি ফাঁকি খেলছে এইটে বুঝতে পারিস না?

বীথির মনে হয়, হাশেম ভাই বেঁচে আছে।

হঠাৎ হাশেম তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, মানুষের আয়ু কত, বীথি?

বীথি ভাবতে ভাবতে উত্তর দেয়, চল্লিশ—- পঞ্চাশ ষাঠ আনকের আরো বেশি।

হাশেম বলল, এটা হচ্ছে মানুষের আরেকটা ফাঁকি। ধৃষ্টতাও বলতে পারিস।

শুনে বীথি অবাক চোখে তাকায়।

হাশেমের চোখে যেন মেঘের মতো ছায়া লেগেছে। সে বলে, মানুষের আয়ু আসলে একদিন দুদিন তিনদিন, বড়জোর চার দিন। কোনো মানুষের আয়ু আবার একেবারেই নেই। মরবার। সময় মানুষ এক মুহূর্তে পেছনের যে কটা দিনের কথা মনে করতে পারে, যে কটা দিনের জন্যে তার আবার জীবন শুরু করতে ইচ্ছে করে, সেই কটা দিনই তার আসল আয়ু। জীবনে এ রকম দিন দুটো তিনটের বেশি আসে না, বীথি।

বীথি তখন নিজের কথা ভাবতে থাকে। চোখ বুজে মনে করতে চেষ্টা করে, সে বেঁচে ছিল কটা দিন? অবাক হয়ে যায়, যখন তার চোখে ভেসে ওঠে সেই রাতটার কথা যে রাতে আবু তাকে নিয়ে বাগানে অশ্রান্ত গায়চারি করছিল আর বলছিল, তোকে কেন ডাকলাম, বীথি?

বীথি বিব্রত হয়ে পড়ে। আর তো সে মনে করতে পারছে না। তাহলে এই কি সে পরম দিন যেদিন তার জীবন ছিল সত্য, পৃথিবী ছিল আনন্দ?

হঠাৎ হাশেম বলে, বীথি, আমার আবার জ্বর আসছে নাকি দ্যাখতো?

উদ্বিগ্ন হয়ে সে হাশেমের হাত ধরে জ্বরটা বুঝতে চেষ্টা করে। বলে, কই না তো।

আসছে রে আসছে। আমি বুঝতে পারছি না? আজ আবার আমার খুব বকাবকি করতে ইচ্ছে করছে।

থাক, তোমাকে বকতে হবে না। ঘরে চলো।

হাশেমের সে কথা যেন কানেই যায় না। বলে, জীবনে বেঁচে থাকার দিন সৃষ্টি কর, বীথি। নইলে মানুষ হয়ে, অনুভূতির মত সাংঘাতিক সব বোমা বুকে নিয়ে জন্মালি কেন? দুজনে বাসায় ফিরে আসে। হাশেমের জ্বর সত্যি আবার এসেছে।

.

বীথি, বীথি, শোন।

বাতাসের মতো অতিদূর, কোমল, প্রায় ফিসফিস কণ্ঠ কাঁপন তোলে। রাত এখন অনেক। বীথির বড় আশা হয়, এই বুঝি সে আবার বেঁচে উঠল ভ্রম হয়, যেমন করে দল মেলে পদ্ম তেমনি করে কোথাও উন্মোচিত হচ্ছে তার জীবন। বীথি বাইরে এসে দেখে আবু তার জন্যে নতমুখে অপেক্ষা করছে। অন্যদিন হলে সে নিজেকে তার ডাকের মুখে পাথর করে রেখে বিছানায় পড়ে কাতরাতে; আজ যেন তার সম্মোহন লেগেছে।

তোর সঙ্গে কথা আছে, বীথি। বাগানে আসবি একবার?

বাগানে সেই পুরনো সিঁড়ির ধাপে বসলো বীথি আর আবু।

ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্যে বীথি তার শাড়ির আঁচল ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বেলি গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেদিন তার কী ভূতে পেয়েছিল, গাছটার অমন সর্বনাশ করে রেখেছে। আজ অবধি একটা নতুন কলিও আসে নি। তবুও কোথা থেকে কিসের সৌরভ ফুটে বেরিয়েছে। তুই আমাকে জ্বালাতেই এসেছিস, বীথি?

বীথি অবাক হয়ে যায়। অবাক হয়ে আবার চোখ নামিয়ে নেয়। তার প্রস্তুত মন যেন আর্তনাদ করে খানখান হয়ে ভেঙে যায়। বেঁচে উঠবার বাসনা ছিল বীথির। আজ যদি আবু বলত, তাহলে সে সব দিতে পারত।

আবু তাকে চুপ দেখে বলে, জ্বালানো নয়তো কী? আমি নাকি তোকে বিয়ে করবার জন্যে খেপে উঠেছি। শুনেছিস?

বীথির তখন উঠে চলে যেতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু শরীরের কী হয়েছে, যেন এইখানে তার জন্ম, এইখানে মৃত্যু।

আবার আবু বলে, কিরে, সবাই বলছে, তোর কানে যায় না?

বীথি কী উত্তর দেবে? অভিমান হয় প্রচণ্ড। বুকটা ফুলতে থাকে কবুতরের মতো। আবু তো ঠাস্ করে তাকে একথা বলতেই পারে। আবুর কি? তার কাছে সে তো কেবল অনুভূতি ঢালবার গেলাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। নইলে কোনদিন কী বীথির দিকে সে তাকিয়ে দেখেছে? এইতো এখনো যে আবু তার সম্মুখে আছে, যেন সে আদৌ এখানে নেই।

কিরে, কথা বলছিস না।

বীথি তখন উত্তর করে, আমি শুনিনি।

শুনে আবু তরংগের মতো ধ্বনি সৃষ্টি করে তার হাসিতে। বলে, সবাই কী একচোখো, বীথি। তোর সঙ্গে যে আমার ভালবাসা নেই, আমি তাকে যে একটুও ভালোবাসি না, এইটে কারো চোখে পড়ল না। চোখে পড়ল কখন তোর কাছে আসি, কখন তুই বেরোস আমার সঙ্গে, এইসব।

বীথি শিউরে উঠে। আবু তার চারধারে এমন এক কঠিন বৃত্ত টেনে আত্মমগ্ন হয়ে আছে যে। দেয়ালের ওপারে তাকাবার চোখ তার অন্ধ এখন।

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে বীথি উচ্চারণ করল, কেন তুমি আমাকে টানো? আর টেনো না। আমি এসব কিছু বুঝি না। তোমার হাতে কি আমাকে মরতে বলো।

এতগুলো কথা একসঙ্গে কোনদিন বীথি বলেছে বলে আবুর মনে পড়ে না। অবাক হয়ে শুধোয়, তোর আজ কী হয়েছে?

কী হবে? কিছু না।

তারপর একটু থেমে যোগ করে, এ কথা বলবার জন্যে আমাকে এভাবে ডেকে না আনলেও হতো।

আবু হাসে।

কেন? কেউ দেখলে গুজবটা বিশ্বাস করবে। এই ভয়, না? একে তুই ভয় করিস?

ভয় করবো কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসিনি। ভয় কিসের?

এই কথাটা বলতে গিয়ে তার যে কী কষ্ট হলো তা আবু জানতেও পারল না। বীথির সমস্ত স্নায়ু যেন টানটান হয়ে যোচড় খেতে লাগল। বীথি কাঠ হয়ে বসে রইল।

আবু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বীথি, তুই আর আমার কাছে আসিস না, আমিও আসবো না। সাধ করে ক্ষতি ডেকে এনে লাভ কী?

বীথি ভাবে, এই যদি তার মৃত্যুর মুহূর্ত হয়, তাহলে পেছনে একটি মাত্র দিন শুধু রইল। আর কিছু না। একটা দিন কি একজন মানুষের অহংকারের জন্যে যথেষ্ট? মরতে তার ভয় করতে লাগল, যেন এখুনি সত্যি সত্যি তার মরণ আসছে।

অশান্ত উঠে দাঁড়ায় আবু।

তবু তো তুই আমাকে বুঝতে পারতি। আজ থেকে সে পথটাও বন্ধ করে দিলাম রে। মরতে হয়, আমি নিজের ভেতরেই মরে যাব।

চমকে ওঠে বীথি। আবুও যে মৃত্যুর কথা ভাবছে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আবু বলে, জানিস বীথি, আমি একটা পাথরকে ভালবেসেছি।

বলতে বলতে আবু যেন স্পষ্ট দেখতে পায় বিলকিসকে।

আমার ভাগ্যটা এমন কেন রে? কী দেখলাম আমি ওর? যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিন মনে হলো, আমার জন্মের মুহূর্ত থেকে ও আমার এইখানটায় বাসা করে ছিল।

আবু হাত দিয়ে নিজের হৃদয় দেখায়। দেখিয়ে বিসদৃশ রকমে চুপ করে থাকে। এক সময়ে জেগে উঠে বলে, কোনদিন ভালবাসলে বুঝবি, এই অক্ষমতার বরফে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকাটা কী।

বলে আবু ফিরে যা বারান্দা দিয়ে। বারান্দা দিয়ে সিঁড়িতে, সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলায় তার নিজের ঘরে। আবু যদি ফিরে আসত তাহলে দেখত, বীথির মাথার ভেতরে আবার সেই অবোধ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, বীথি নিঃশব্দে কাঁপছে হাঁটুর ওপর মুখ নামিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

৬. পাখাটা ছেড়ে দিয়ে বিলকিস বলল

পাখাটা ছেড়ে দিয়ে বিলকিস বলল, বসুন। আমি এখুনি আসছি।

রোদ্দুরে রোদ্দুরে বেশ তো হেঁটে বেড়ানো চলছিল আবুর, বিলকিস তাকে গাড়ি থামিয়ে তুলে নিয়ে এসেছে বাসায়। সেদিন সে তাকাতে পারেনি বলে আজ কি মোলআনায় শোধ দেবার ইচ্ছে?

ভেতর থেকে একটু পরে পারিজাতের হাতে এলো নেবুর এক গেলাশ ঠাণ্ডা শরবৎ। পারিজাত তাকে দেখে হাসল এবং গেলাশ নামিয়ে রেখেই দৌড়ে পালাল।

বড় রোদ, একেবারে আসমান শুদ্ধ তেতে উঠেছে, শরবতের গেলাশ হাতে নিয়ে ভাবলো আবু। সেটা ঠোঁটে ঠেকিয়েছে কী ঠেকায় নি, বিলকিস পর্দা ঠেলে এসে বসলো। মাথায় তার আধ ঘোমটা কাপড় তুলে দেয়া।

অপরূপ লাগল।

রোদ্দুরটা এড়াতে গিয়ে ও ঘর থেকে আসবার সময় হয়ত মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছিল, এখনো নামিয়ে নেয়া হয়নি।

বাসায় এসে বিলকিস তার পরনের শাড়িটা বদলে নিয়েছে। এখন যেটা পরে তার সমুখে বসে আছে ঠিক তেমনটি যেন কতকাল আগে মা পরতেন, ভাবল আবু। পাড়ের মধ্যে নীল সুতোয় আঁকা ময়ুর, বাড়ি, গাছ, তারপর আবার ময়ুর বাড়ি, গাছ—- পর পর আবার ময়ুর, বাড়ি, গাছ। তার পায়ের পাতা ঘিরে কোলের ওপর দিয়ে, বুক জড়িয়ে মাথার পরে গিয়ে পৌঁছেছে ময়ুর, বাড়ি, গাছ।

তন্ময় হয়ে দেখছিল আবু। মায়ের ট্রাঙ্ক খোলন্যাপথলিনের ঘুম পাড়ানো ঘ্রাণটা যেন ফিরে আসছে।

বিলকিস কোনরকম ভূমিকা না করে সোজা বলল, সেদিন কি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

তার ছোট্ট চিঠিটার কথা বিলকিস আজো ভুলতে পারেনি। বিলকিস বলল, এমন করে চিঠি লিখে গেলেন, যে কেউ দেখলে একটা কিছু ভেবে বসত। কেন লিখতে গেলেন ও সব? আমি তো কারো সঙ্গে রেখে ঢেকে মিশিনি।

শেষ কথাটার সঙ্গতি খুঁজে পেল না আবু। একটুপর উত্তর করল, কী জানি কেন লিখলাম। দেখুন না, আপনার থাকবার কথা ছিল, থাকলেন না, আগে থেকে নোটিশও দিলেন না। অনেক দূর বয়ে এসেছিলেন, না পেয়ে রাগ হবারই কথা।

খুব বোদ্ধা মানুষের মতো ভান করে আবু; নিজেকেই নির্মমভাবে বিশ্লেষণ করতে থাকে সে। বলে চলে ক্ষমাহীন কণ্ঠে, মনটা বুঝতে চাইল না। কেন চাইল না? কী জানি। ছেলে মানুষের মতো রাগ করে বসল। নইলে সত্যি তো কী করে সম্ভব হল? অন্যায় হয়েছে। থাক, খুব হয়েছে।

বিলকিস তাকে বাঁ হাতের করতল তুলে বাধা দেয়। বিলকিস যেন আবছা আবছা বুঝতে পারে আবু তার মনের একটা গোলমাল ঢাকতে গিয়ে অযথা নিজের প্রতি রুঢ় হচ্ছে। বিলকিসের যেন মন হয় তার চোখের ভেতরে দুর্বোধ্য কী একটা লিপি পড়তে পারছে। উল্টা দিকে আবু ভেতরে আচমকা পরম একটা আলস্য অনুভব করতে থাকে। সব কিছু নিরর্থক মনে হয়। খামোকা বলে, আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করতে চেয়েছিলাম একদিন।

আমি তো ভালো গল্প বলতে জানি না।

বেশ তো, আমি না হয় বলবো, আপনি শুনবেন।

শোনার অভিনয় করতে পারবো হয়ত। তাতে খুশি হবেন?

নিষ্ঠুর শোনায় কথাটা। আবু একটা কথাও বলতে পারে না। যেন এক ফুঁ এ কেউ বাতি নিবিয়ে দিয়েছে। চোখের সমুখে মিছিল করে চলতে শুরু করেছে ময়ুর বাড়ি গাছ, আবার ময়ুর বাড়ি গাছ, আবুর চোখ এসে তার রক্তিম পা ঘিরে পাড়ের ওপর স্থির হয়।

বিলকিসও বুঝতে পারে এমন করে কথাটা বলা ঠিক হয় নি। কিন্তু না বলেও তো উপায় ছিল না। মিছেমিছি লোকটা ভুগবে। সহজ করে দেয়ার জন্য বিলকিস জিগ্যেস করল, সেদিন কে এসেছিলেন?

কোথায়?

আপনাদের বাসায়।

আমার বড় ভাই।

বাইরে ছিলেন বুঝি?

আবুর মাথায় ভেতরে হঠাৎ বাঘের মতো একটা উজ্জ্বল দীপ্তি লাফ দিয়ে পড়ে। ঝুঁকে পড়ে সে বলে, হাশেম ভাই বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিলেন।

পালিয়ে?

বিবাগী হয়ে।

সে আবার কী?

আবু যেন খুব তুষ্ট হতে পারছিল না বিলকিসের মুখে পালিয়ে শব্দটা শুনে। নিজের ওপরেও রাগ হলো, কেন সে শব্দটা ব্যবহার করতে গিয়েছিল! হাশেমকে যেন সে ভীষণ ছোট করে ফেলেছে। অনুতাপ হতে লাগল তার। বলল, একজনকে ভালবাসতেন হাশেম ভাই।

কী হলো তার?

সে ভালবাসত না।

বিলকিসের কাছে কথাটা বলতে গিয়ে কেমন হাস্যকর শোনাচ্ছে আবুর নিজের কানেই। এ কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে সে বিব্রত বোধ করতে থাকে। অপেক্ষা করতে থাকে কখন বিলকিস সত্যি সত্যি হেসে ফেলবে, সে মনে মনে চটে যাবে কিন্তু কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্য, বিলকিস হাসল না। বরং তার গভীরতম দেশে গিয়ে বাসা করে নিল আবুর কথাকটি। ছায়া হয়ে এল তার সারাটা মুখ। বলল, জানেন, মানুষের ভেতরটাকে এত আমি চিনেছি যে, আপনার ভাইয়ের ব্যথাটা যেন বুঝতে পারলাম।

আবুর তখন তীব্র ইচ্ছে করে নিজের আত্মার ওপর থেকে একটানে সমস্ত আবরণ ফেলে দিতে। মাথার ভেতরে এক অশান্ত নাচ হতে থাকে। মানুষের ক্ষমতা এত বাধা কেন? তার মনের পৃথিবীকে কেন শুধু কথার ভেতর দিয়ে, কাজের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে

হবে? জানান না দিলে কেন কেউ বুঝতে পারবে না তার ভেতরে কী হচ্ছে? এ শক্তি কেন মানুষ পেল না যে, সরাসরি আত্মা থেকে আত্মায় ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত তরংগ?

একী? আপনি বড্ড ঘামছেন।

আবুর চমক ভাঙ্গে।

পাখাটা বাড়িয়ে দেব?

দিন।

পাখা হঠাৎ দুরন্ত গতি পেল। তার বাতাসে যেন ঝড় উঠল বিলকিসের শাড়িতে, চুলে। পাখার কেন্দ্র থেকে সরে আসতেই আবার শান্ত হয়ে গেল সব। বিলকিসকে হঠাৎ রক্তের মধ্যে আপন করে অনুভব করে আবু। মনে হয়, তার মাথার ভেতর থেকে একটা শক্তি ফেটে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাসিয়ে দেবে সব কিছু। মুখে বলে, আমাকে উঠতে হবে।

যাবেন?

আবুর সত্যি সত্যি যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু বসে থাকাও অসম্ভব। জোর করে সে বলে, হা। দরকার আছে।

এলেন, বসলেন না। বলছিলেন গল্প করবেন।

আবু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মুখ অন্য দিকে রেখে উচ্চারণ করে, কাল, না হয় পরশু আবার আসব।

তার কথা বলার ধরনটা অদ্ভুত লাগে বিলকিসের কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে বকুলের ঠিকানার কথা। বলে, বকুলের ঠিকানাটা নিয়ে যান।

পেয়েছেন? কী করে?

জবাব না দিয়ে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ঠিকানাটা লিখে দেয় বিলকিস। লিখতে লিখতে বলে, বকুলকে ভালোবাসত আপনার হাশেম ভাই, না?

শুনে অবাক হয় সে। বিলকিস কী করে টের পেল? বকুল তাকে বলেছে? অসম্ভব, সে বলতেই পারে না। কিছুতেই যেন আবু ভাবতে পারে না, বকুল উচ্চারণ করবে এই অতীত। বিস্মিত আবু ঠিকানাটা হাত বাড়িয়ে নেয়। বিলকিস দরোজার পর্দা ঠেলে ধরে বলে, আসবেন কিন্তু।

আবু কোনো উত্তর না দিয়ে পথে নেবে আসে। সমস্ত শক্তি যেন তার অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তার চেতনা আচ্ছন্ন করে সঙ্গীতের মতো ফিরে ফিরে বাজতে থাকে আসবেন কিন্তু আসবেন কিন্তু।

বিলকিস যেটা তাকে বলতে গিয়ে বলতে পারে নি বকুল তার বড় বোন।

.

আগুন পথের দুধারে ফুলে ফুলে জ্বলছে একেকটা গাছের চূড়ায়। চোখ ধাধিয়ে দেয়। চোখ রাখা যায় না। প্রকৃতি যেন আজ ষড়যন্ত্র করে আবুর সঙ্গে চতুরালি করছে। কোনদিন যা চোখে পড়ল না, বিলকিসের বাসা থেকে বেরিয়েই দুচোখের দুয়ার ঠেলে তা ভেঙে পড়ছে। চলতে চলতে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে গাছের অজস্র শিখরের দিকে। কোথায় যেন মিলের আভাস।

তার মনটাও এখন এমনি অস্থির অথচ উদাস; এমনি মাতাল করা, লাফিয়ে পড়া, অথচ দূর। পথ দিয়ে চলছে, তবু মনে হচ্ছে এখনো বিলকিসের সমুখে বসে আছে। এখনো যেন স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছে ঐ প্রখর উজ্জ্বল বর্ণের ভেতরে।

বিলকিসকে আজো কিছু বলা হলো না। মনের ভেতরে চাপা একটা আক্রোশ ফুসতে থাকে। কী হতো বললে? হয়ত যা হতো, তা স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। হয়ত, বিলকিস অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। পরে আবছা গলায় উচ্চারণ করত, আমি জানতাম।

আবুর দুচোখ পুড়ে যেতে থাকে রক্তিম ফুলে।

অস্থির হয়ে বাম করতলে ডান হাত মুঠো করে সে আঘাত করতে থাকে। খুব হাঁটতে ইচ্ছে করছে। রোদে তেতে জ্বর জ্বর হতে ইচ্ছে করছে। তীক্ষ্ণ, দুর্বোধ্য, মানে হয় না উচ্চারণে মুখটা ব্যথা করে ফেলতে ইচ্ছে করছে, ঠিক যেমন ছোটবেলায় একেকদিন করত। অকারণে তখন হঠাৎ খেপে গিয়ে ধুলো পানি ঝড়ে একাকার হয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু সেই অনেক আগের দিনগুলোয় ছিল না বেদনার স্মৃতি। আর আজ কোথায় যেন বেদনার বীজ অংকুরিত হয়ে উঠবার জন্যে থরথর করে কাঁপছে।

এ আমার কী হলো? এ আমার কী হলো?

আবু মনে মনে বুক-ভাঙ্গা-মন্ত্রের মতো আওড়াতে থাকে। আবার চোখ মেলে ওপরের দিকে, সামনে ডানে বামে তাকায়। গাছ আর গাছ।

রঙের উৎসব লেগেছে ডালে ডালে।

.

যেন সে জানত বীথি বসে বসে বই পড়ছে এই ঝিমঝিম দুপুর বেলায়। তক্ষুনি বাসায় ফিরে সোজা বীথির ঘরে এলো।

বীথি সত্যি সত্যি বই পড়ছিল। সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়াল আবুর রোদে পোড়া লাল চেহারা দেখে। কোথায় ছিল? কী করছিল? বীথি বুঝতে পারল না, আসবে না বলে মাত্র কালরাতেই প্রতিজ্ঞা করবার পর আজ এমন কী অসাধারণ কারণ ঘটলো যে আসতে হলো?

যে কোনো কারণই থাক, জোর করে পাথর হতে চেষ্টা করল বীথি। সে সব শুনেছে, সব টের পেয়েছে। তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এ বাসা থেকে বড় চাচার বাসায় নিয়ে যাবার জন্যে। যাবে না সে, কিছুতেই যাবে না।

আবু বলল, বীথি আছিস?

যেন খুব নিশ্চিন্ত হলো তাকে ঘরে পেয়ে। হাত বাড়িয়ে বলল, আয়, আমার সঙ্গে।

আশ্চর্য হলো বীথি। প্রতিজ্ঞার কথা মানুষ মাত্র ষোল ঘণ্টার ব্যবধানে ভুলে যায় কী করে? আবু আবার বলল, আয় না।

আস্তে আস্তে চেয়ারে গিয়ে আগের মতো বসলো বীথি। বইটাকে আঁকড়ে ধরল শক্ত হাতে। বুঝতে পারল আবুর সেই আবেগ উদ্দাম মুহূর্তগুলো আবার ফিরে এসেছে। সেই উদ্দামতার তাড়নায় কোন কিছুই আর টিকতে পারছে না।

আবু একটা চিত্রের মতো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ তার আকুল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের পরে অনুপম সি আঁকা। হাসিটা যেন বলতে চায়, ভয় কী? হাসিটা যেন পৃথিবীর সমস্ত অশুভের বিরুদ্ধে জয়ের প্রতীক চিহ্ন। বীথি বই ওলটাতে ওলটাতে জোর করে উচ্চারণ। করল, না, না।

মাথা নাড়তে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে। আরেকটু হলেই অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। চোখ একেবারে ভরে উঠেছে। মুছতে পারছে না, পাছে আবু দেখে ফেলে। নিজেকে সে জোর করে মগ্ন রাখতে চেষ্টা করে বইয়ের পাতায়। আবু তখন পেছনে এসে দুহাত দিয়ে বীথির দুকাধ শক্ত করে ধরে। মুখ নাবিয়ে বলে, রাগ করেছিস? সেদিন আমার চিঠিটা পেয়ে সত্যি সত্যি রাগ করলি?

বীথি বিস্মিত হয়ে যায়। চিঠিটার কথা বুঝতে পারে না। আবু তাকে তো কোনো চিঠি লেখে নি। বীথি বলে, কোন চিঠি?

আবু যেন শুনতেই পায়নি। যেন বলাটাই তার একমাত্র কাজ। আবু কণ্ঠে মমতা তুলে বলে চলে, আমার চিঠিতে তুই ঝাজটুকুই দেখলি, আমাকে দেখলি না? বেশ তো, যদি চাস আমি আসব না। তাহলে আসব না।

আবু তো বীথির মধ্যে বীথিকে দেখছে না। বীথি তখন আবুর চোখের দিকে তাকায়। ভয় করতে থাকে।

তোমার কী হয়েছে, আবু ভাই?

আমার? কিছু না তো।

আবু মনে মনে বুঝতে পারে, যার উদ্দেশে এই বলা সে বীথি নয়, কিন্তু তবু বীথিকেই তার বলতে হচ্ছে। এতে উপশম হচ্ছে, মনের ভেতরে মুক্তির স্রোতোধারা বয়ে যাচ্ছে। আবু তাকে দুপায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। বলে, চল, বীথি।

বীথির তখন কী হয়, তাকে অনুসরণ করতে থাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

.

বীথি আর আবুকে দেখা যায় হাইকোর্টের পাশ দিয়ে মগবাজারের দিকে হাঁটতে। রোদে তেতে উঠেছে ফুটপাথ। লম্বা রাস্তাটা সুম সুম করছে উত্তাপে। একটা গাছের ছায়ায় পানির কল। পানি জমেছে এক চিলতে। সেখান থেকে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে চকিত একটা কাক। আবু বলতে থাকে, আমাকে তোর কী মনে হয়, বীথি?

বীথি কী জবাব দেবে বুঝতে পারে না। মনে মনে তোলপাড় করতে থাকে, এ প্রশ্নটাও কি তাকেই করা? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। উত্তর করে, আমার কী মনে হয়, জেনে কী করবে?

কী জানি কী করবো। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে যে। জানিস বীথি, আমার মাথার মধ্যে কিস্‌সু ঢুকছে না। খালি মনে হচ্ছে, আমার বুঝবার শোনবার সব শক্তি চলে যাচ্ছে। যে জিনিসটা একেবারে সামনে, তাকেও যেন কেউ দেখিয়ে না দিলে দেখতে পারব না—এমনি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমার এ কী হলো, বীথি?

তাড়াতাড়ি বীথি বলে, রোদে হাঁটতে বলেছে কে তোমাকে?

কে আবার? কি করবো তাহলে?

অসুখ করবে যে।

তার কি বাকি আছে রে?

বীথি ছায়া ঘেঁষে ঘেঁষে চলে। তার সঙ্গ নেয়ার জন্যে আবুকেও ছায়ার ভেতর দিয়ে চলতে হয়। আবু বলে, তোর ওপরে ভারী অবিচার করলাম।

বীথির বুকটা স্তব্ধ হয়ে যায়।

কদিন থেকে শরীর খারাপ তোর, তোকে এই রোদে বার করে আনলাম। মরে যাস যদি?

বীথির তখন মমতা হয়। উত্তর করে, আমার কিছু হয়নি তো। তোমার কথা বলছিলাম। তুমি একটা অসুখ বাঁধিয়ে বসবে এই আমার ভয়। যাচ্ছ কোথায়?

আবু তার দিকে তাকিয়ে আনমনে হাসে। বলে, হঠাৎ আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি কী অসম্ভব রক্ত রঙ ফুল ধরেছে। তখন বুঝলি বীথি, আমার মাথার ভেতরে সেই আগুন জ্বলে উঠল। থমকে দাঁড়ালাম। তোর হাসি পাচ্ছে? তোকে ডাকতে হলো। তুই না এলে কী করতাম?

আবু আস্তে আস্তে নিজের অস্তিত্ব আর সঙ্গতি ফিরে পাচ্ছে দেখে বীথি একটু আশ্বস্ত হলো।

যে উন্মত্ততা একটু আগে বাসায় দেখেছিল এখন তা পড়ে এসেছে। বীথি বুঝতে পারে, আবুর একটা ধাক্কা লেগেছে কোথাও। যেন হাশেম ভাইয়ের কথা বলার আভাস ফুটে বেরুচ্ছে তার কণ্ঠ থেকে। কেবল সেই ধাক্কাটা ভালো না মন্দের দিকে এইটে বীথি বুঝতে পারছে না। দাঁড়াও, আবু ভাই।

কেন রে?

বীথি যেন সব বুঝতে পারছে। বীথি চোখ মেলে দেখতে থাকে ফুলে ফুনে আকাশের নীলের ভেতরে লাল একটা রাজপথ। যেন আস্তে আস্তে ওদের দুজনকে চারদিক থেকে এইসব আগুন ফুলগুলো জড়িয়ে ধরছে। ডুবিয়ে দিচ্ছে আশেপাশের সব কিছু।

আর আবু ভাবতে থাকে, বিলকিস এখন কী করছে? সে অনুভব করতে পারে বিলকিসের আত্মা তার খুব কাছে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে নিরিখ করছে। আবু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বীথি মুখ ফিরিয়ে বলে, যাই।

যাবি? কেন? না যেতে পারবি না।

কোন জবাব না দিয়ে বীথি একা একা হাঁটতে থাকে। আবু যখন বারবার তাকে ফেরাবার চেষ্টা করে তখন কঠিন হয়ে বলে, কাল রাতে কথা দিয়েছিলে না?

দিয়েছিলাম। তাহলে এলি কেন?

আবু কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তাকে।

শোন, বীথি।

রাস্তায় একটা সিন না করলেই না, আবু ভাই?

তিরস্কারটা শুনে ফেটে পড়ে আবু।

আমি না হয় তোকে জ্বালাই, তাই বলে সিন করতে পারব ভাবতে পারলি? যা, যেখানে খুশি যা। তুই মরে যেতে পারলি না?

যাবোই তো, মরেই যাবো।

বীথি একটা খালি রিকশা পেয়ে উঠে বসলো। বলল, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?

আবু কোনো জবাব না দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়।

.

রাস্তার মোড়ে কামালের সঙ্গে দেখা। আবুকে দেখে সে রিকশা থামায়, জিগ্যেস করে, ক্লাশ শেষ হলো বুঝি?

উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না। কোন রকমে বলল, হ্যাঁ।

তাহলে আয় আমার সঙ্গে। মেলা খবর আছে।

বীথি চলে যাবার পর আবার আবুর মাথার মধ্যে প্রপাতের মতো ফিরে এসেছিল বিলকিস। বিলকিসের ওখানে যে কথাগুলো হয়েছিল সব একাকার হয়ে একটা সিম্ফনির

মতো বাজছিল। বিলকিসের সমুখে এসে নিজের অক্ষমতা, নিজের বোবা হয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তিকে শাপ শাপান্ত করছিল সে। বিলকিসের কাছে আবার যেতে ইচ্ছে করছে। এখন গেলে কেমন হয়? না। দুপুরে দুবার দেখা হলে কী ভাববে বিলকিস? এ-কী টানাপোড়েন! যার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা, সংকোচ তার কাছেই? নিজেকে খুন করে ফেলতে পারলে যেন শান্তি পাওয়া যেত। আবু হঠাৎ নিজেকে চোখ বুজে ছুঁড়ে মারে কামালের দিকে। বলে, চল, কোথাও বসি। সেদিন খাওয়াতে চেয়েছিলি, আজ হোক।

রিকশায় উঠে বসে আবু শুধালো, কী খবর বল? মেলা খবর শুনে মনে হচ্ছে ভাগ্যটা হঠাৎ ফিরিয়ে ফেলেছিস তুই?

কামাল সুখী আত্মবিলাসী হাসি হাসল। তার হাসিটা অন্যসময়ে আবুর কাছে ভালগার মনে হতে পারত। কিন্তু এখন চোখেই পড়ল না। হাসির তোড় থামিয়ে কামাল বলল, হঠাৎ দুটো লাইসেন্স পেয়েছি। সেদিন বলছিলাম না খুব লস হচ্ছে?

আবু কামালের কথার ভেতরে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। যেন কামালের ব্যবসার ওঠা পড়ার সঙ্গে তার এবং সারা পৃথিবীর উত্থান পতন নির্ভর করছে।

.

মাগরেবের নামাজ পড়তে গিয়ে আজ কেমন খালি খালি লাগে মরিয়মের। মনে হয়, কী যেন নেই তার সংসারে। কী যেন ছিল, হঠাৎ করে পালিয়ে গেছে। নামাজ পড়ে মুনাজাত করতে গিয়ে নিজের হাতের ভেতরে, সন্ধ্যার করুণ অন্ধকারের ভেতরে বীথির মুখ দেখতে পান মরিয়ম।

বীথিকে আজ বিকেলে খোরশেদ চৌধুরী এসে নিয়ে গেলেন। মেয়েটা কাঁদে নি, কোন কথা বলে নি। মরিয়ম যেন অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারছিলেন, বীথির হৃদয়টা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

কদিন থেকে ওকে নিয়ে যাবার কথা হচ্ছিল। মরিয়ম নিজে পারেন নি মেয়েটাকে বলতে। মুরশেদ চৌধুরী বলেছিলেন।

কথাটা শোনার পর থেকে বীথিকে লক্ষ্য করেছেন তিনি। আশ্চর্য হয়েছেন ওর সহ্য করবার ক্ষমতা দেখে। অতটুকু শরীরে এত বড় ব্যথাকে কবর দেয়ার শক্তি ও পেলো কোথায়? বীথি যে চলে যাচ্ছে, তাকে চলে যেতে হচ্ছে, এটাই যে তার শেষ যাওয়া এ বাড়ি থেকে এইটে তিনি ভুলতে পারছিলেন না। তবু যদি মেয়েটা ভালোয় ভালোয় যেত তাহলে মরিয়ম কাঁদতে পারতেন—- চলে যাওয়ার শোকটাকে মুক্তি দিতে পারতেন। কিন্তু যে অপবাদ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল তা মনে করে কাঁদতে সাহস পান না তিনি। বদলে কান্নাকে অনুমতি দিয়েছেন তাঁর অন্তরকে খাক করে দেওয়ার জন্য।

বিরাট নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে অশান্ত পাতাগুলোর মতো মরিয়মের ভেতরটা হুহু করে ওঠে। বীথিকে নিয়ে যে তিনি কতখানি ভরে ছিলেন, আজ চলে যাবার পর তা ভীষণ রকমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নামাজ পড়ে ওপাশের বারান্দায় গেলেন মরিয়ম। সেখানে হাশেম একটা ইজিচেয়ারে চোখ বুজে পড়ে আছে। সন্ধ্যের একটু আগে ওকে শোয়া থেকে উঠিয়ে এনে বাইরে বসিয়ে দিয়েছেন। নইলে আল্লাহর লানৎ পড়বে।

এসে তার কপালে হাত রাখলেন মরিয়ম। জ্বরটা কমেছে একটু। এত ডাক্তার দেখালেন, ওষুধ আনালেন, কিন্তু তবু ছেলেটা ভালো হচ্ছে না দেখে মন তাঁর এমনিতেই খারাপ হয়ে। আছে। আজ পাঁচ বছর পর হারানো ছেলে কি ফিরে এসেছে মায়ের কোলে মরবার জন্যে?

সময়টা ভর সন্ধ্যে। মরিয়ম বুকে থুতু দিলেন, দরুদ পড়লেন। সন্ধ্যে বেলায় এমন অলুক্ষণে কথা মনে আনতে নেই। আল্লাহ তুমি মাফ কর।

হাশেমের পাশে মেঝেয় বসে ছেলের হাত ঘসে দিতে লাগলেন মরিয়ম। যেন তার করতল থেকে মৃত্যুর বিরুদ্ধে শক্তির ফৌজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন ওর আত্মায়। হাশেম চোখ মেলে। তাকাতেই মরিয়মের বুকটা ভেঙ্গে পড়ল। এই ছেলেটা কত ছোট ছিল একদিন। তাঁর কোল ভরে চাঁদের মত শুয়ে থাকত। ইচ্ছে করলে, হাশেমকে যেন এখনো তিনি কোলে করতে পারবেন।

বললেন, ঘরে যাবি, বাবা?

হাশেম হাসল। কথা বলল না। কিন্তু ওতেই বোঝা গেল, ঘরে যাবে না। মরিয়ম চুপ করে। তাকিয়ে থাকেন। হাশেম তবু এ কদিন বকাবকি করত, যা খুশি তাই বলত। আজ সকাল থেকে একেবারেই চুপচাপ। আশঙ্কা হয় তার। হাশেম যে কথা বলছে না, এটা অশুভ চিহ্ন বলে মনে হয়। মনে হয়, হাশেম এখুনি উঠে পায়চারি করে বেড়াক, এলোপাথারি কথায় কান ঝালাপালা করে দিক—- তিনি স্বস্তি পাবেন। তিনি তবু অনুভব করতে পারবেন হাশেম বেঁচে আছে, হাশেম ভালো আছে।

মরিয়মের আকুতিটা যেন গিয়ে পৌঁছুলো হাশেমের অন্তরে। হাশেম বলে উঠল, তোমার ভয় করছে, মা?

কেনরে?

আমি মরে যাবো বলে।

বালাই ষাট, সোনা আমার।

মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়ে তুমিও কম কষ্ট পাচ্ছ না।

মরিয়ম অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকান। যেন ছেলের কাছে করুণ একটা অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছেন তিনি। বললে, কষ্ট কী? পরের মেয়ে, চিরদিন থাকবে বলে তো

আসেনি। চিরদিন থাকবে বলে তো কেউ আসে না। তবু কষ্ট হয়। কষ্ট না হলে তুমি আজ অমন করছ কেন?

মরিয়ম কিছু বলেন না। হাশেমের কাছে ধরা পড়েও যেন ভাল লাগছে।

হাশেম বলল, নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, মা। পাখিগুলো ঘরে ফিরে এসেছে। সারাদিন কোথায় ছিল ওরা? আকাশে বাতাসে মাঠে ঘাঠে সারাটা পৃথিবী ভরে উড়ে বেরিয়েছে। তারপর রাতের আশ্রয় যেখানে, যেখান থেকে ভোরবেলায় বেরিয়েছিল, সেখানে ফিরে এসেছে সবাই। আমার কী মনে হয় জানো মা? এই ছবিটাকে যদি সহজ করে মানুষ বুঝত, তাহলে কোনো দুঃখই থাকত না। সহজ বলেই তো বুঝতে পারাটা এত কঠিন। প্রাণের টান যেখানে, সে যেখানেই যাক না ফিরে আসবে। আমি তো বলি, মানুষ মিথ্যেই কষ্ট পায়। আমরা বাইরের পাওয়া, বাইরের চেহারাটাকে এত দাম দিয়েছি যে অন্তরকে একেবারে পায়ে ঠেলে বসে আছি। কেউ বুঝলো না বলেই তো খ্যাপা লাগে আমার।

মরিয়ম শুনতে শুনতে ওর কপালে হাত রাখেন। মনে একটু আশার সঞ্চার হয়। হাশেম আবার বকতে শুরু করেছে, যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তিনি আদর করে বলেন, সবাই বুঝবে কী? সবাই তোর মতো পণ্ডিত হলে বুঝত।

পাণ্ডিত্যের কী আছে, মা? ঐখানেই তো আরেকটা মস্তফাঁকি। পাণ্ডিত্য দিয়ে তর্ক করা যায়, ভয় দেখানো যায়; বোঝানো যায় না, ভালোবাসা যায় না। অন্তরকে বুঝতে হলে অন্তর দিয়ে। বুঝতে হয়।

কথা শেষ করে মায়ের করতলের নিচে পড়ে থাকে হাশেম।

৭. আবু সেই যে দুপুরে

আবু সেই যে দুপুরে এক পলক এসেই বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি। হাশেম ছিল বিছানায় শুয়ে। যাবার আগে বলে যেতে এসে বীথি তাকে ঘুমন্ত দেখেছিল। ইতস্তত করে ফিরে যাচ্ছিল। তখন হাশেম বলে উঠেছে, শোন। মনে করেছিলাম চোখ বুজে তোকে ফাঁকি দেব। কই, পারলাম না।

বীথি কাছে আসেনি। ঘরের মাঝখানেই অধোমুখে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ওরকম দেখে হাশেম বলেছে, যা তুই। জেলখানায় না দ্বীপান্তরে যাচ্ছিস যে বিদায় নিতে হবে তোর। আসিস একবার, কেমন?

শুনে খোরশেদ চৌধুরী হা হা করে হেসে উঠেছিলেন।

দ্বীপান্তরেই তো! কী বলিস, বীথী? আসতে যেতে ছআনা লাগে রিকশায়, সোজা কথা? যাবার আগে মরিয়ম বীথিকে কোলের কাছে বসিয়ে অনেকক্ষণ আদর করেছিলেন। বলেছিলেন, শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিস, মা। বড় চাচিকে বলিস, কদিন হলো ভালো নেই তুই। তোর চাচাকেও বলে দিলাম। কাল তোকে দেখতে আসব।

তন্ময় ছবিটা থেকে মরিয়ম চমকে ফিরে এলেন বর্তমানে। যাবার সময়ে বীথির চোখে পানি ছিল, এখন তার চোখে। কোনো মতে আঁচল ঠেকিয়ে হাশেমকে বললেন, তুই এখানেই বসবি? না, ভেতরে যাবি?

এখানেই ভালো।

তাহলে বোস। আমি রান্নাঘরটা দেখে আসি।

মরিয়ম উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বীথির খালি ঘরটা চোখে পড়ল। ভেজানো ছিল দরজাটা। বাতাসে কখন আধো খুলে গেছে। বীথি থাকতেও মাঝে মাঝে এমনি কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যেত না।

.

আবু সোজা এসে তার নিজের ঘরে ঢুকল। কামালের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে যে বেপরোয়া আড়াই মেরেছে তা নয়, তার সঙ্গে প্রথম শোর ছবিও দেখেছে। অর্থাৎ মনটাকে নিয়ে ঘণ্টা পাঁচেক কৌতুক করেছে আবু। এখন আবার সেই ভাবনাগুলো ফিরে এসেছে। চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে বিলকিসের শাড়ির পাড়ে আঁকা ময়ূর, বাড়ি, গাছ। মনে করেছিল, ক্লান্তি অবোধ করে রাখবে মনটাকে। কিন্তু তা হলো কই? ক্লান্তি এসেছে ঠিকই, ভীষণ ক্লান্তি, কিন্তু মনটা আরো সূচীমুখ হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ ভুলে থাকার পর, বাড়ি ফেরার পথে, মাথার ভেতরে নাচ শুরু হয়েছিল আবার। এখনো সেটা থামে নি।

কাপড় বদলে নিচে নামল আবু। আজ তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। এমন খিদে যদি সবদিন পেত, মায়ের আর কোনো অনুযোগ থাকত না। মাকে আজ তাক লাগিয়ে দেবে আবু। বীথির দরজা বন্ধ দেখে ভাবলো, অন্ধকারে শুয়ে মেয়েটা হয়ত দুপুরের কথা ভাবছে। বড় অবিচার করা হয়েছে তার ওপর। ভাবল, ফিরে এসে ডাকবে। ডেকে বলবে, বীথি তুই আমার কথায় কিছু মনে করিস নে।

খেতে বসে দেখল, মা নেই। মা না থাকলে বীথি থাকে। মাকে গিয়ে ডাকল আবু। মরিয়ম বললেন, আমার শরীরটা ভালো নেই রে।

বলতে বলতে উঠে আসেন তিনি। আবু বলে, থাক।

বলেই সে নেমে আসে খাবার ঘরে। তন্ময় হয়ে খাচ্ছিল, মরিয়ম এসে পিছনে দাঁড়ালেন। বুঝতে পারলেন, আবু এখনো টের পায়নি। যদি জানতে পারে বীথি চলে গেছে, তাহলে কী হবে?

মায়ের মন মরিয়মের। আবু সত্যি সত্যি বীথিকে ভালবাসত কিনা জানতে ইচ্ছে করল তার। কথাটা বলে দেখলে কেমন হয়? বীথির চলে যাওয়ার সংবাদে ওর মুখ চোখ তো তাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তার চোখে পড়বেই। আশায় তিনি সমুখে এসে দাঁড়ালেন।

প্রায় চমকে উঠেছিল আবু। মাকে দেখে রুষ্ট কণ্ঠে বলল, তোমাকে না বললাম এসো না?

তুই কি একা বসে খেতে পারবি?

আবু কোনদিন একা বসে খেতে পারে না। কেউ না কেউ থাকবে, কথা বলবে কী সঙ্গে খাবে, এই অভ্যেস। মরিয়ম হাসলেন। বললেন, তোর বড় চাচা এসেছিল।

আবু কথা বলল না। ভাবল, হাশেম ভাইকে দেখতে এসেছিল। মাথা নিচু করে খেয়ে চলল সে।

বীথিকে নিয়ে গেল।

চমকে মায়ের দিকে তাকাল আবু। দেখল, মা দুচোখ মেলে তাকে দেখছেন। অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল সে। কিছু একটা বলা দরকার। বলল, কখন?

বিকেলে। বীথি এখন থেকে ওঁর কাছেই থাকবে।

আবুর থমথমে মুখ দৃষ্টি এড়াল না মরিয়মের। ছেলে তক্ষুনি হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়াল। পীড়াপীড়ি করতে ভুলে গেলেন তাকে আরো খাওয়ার জন্যে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। যেন এই ছেলেটা পর হয়ে গেল তাঁর।

সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে এক পলকের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আবু। বীথি চলে গেছে! দুপুরের ঘটনাটি মনে পড়ল তার।

বীথি কি জানতো যে আজই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে?

.

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল আবু। বীথির আজ দুপুরের চেহারা, কথা আর পথ থেকে হঠাৎ চলে যাওয়া, মনে পড়তে থাকে। চলে যাবে জানলে কাল রাতের প্রতিজ্ঞাটা কক্ষনো ভাঙ্গতে না সে। মনে মনে আবছা অনুতাপ হয় তার।

বীথি চলে গেছে বলে প্রথমে যেমন এখন আর অতটা খারাপ লাগছে না। থেকে থেকে কেবল মনে হচ্ছে, বীথি ছিল বলে একটা আশ্রয় ছিল তার।

আর কিছু না। গেছে যাক। আসলে বিলকিস আজ তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। মাথার ভেতরে যে নাচ হচ্ছে তার উৎস বিলকিস।

উঠে এসে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে থাকে আবু। তারপর নেবে এসে নিমগাছের নিচে। সেখান থেকে বাগানে। বাগানের সিঁড়িতে বসে ঠাণ্ডা বাতাসে প্রীত হতে থাকে আবু। মনে মনে আলোড়ন চলতে থাকে বিলকিসকে নিয়ে। নিজেকে যেন সারাদিন পর আবার সে ফিরে পাচ্ছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বিলকিসকে। তার সারাটা শরীর আর আত্মা থরথর

করে কাঁপতে থাকে। নিজেকে শান্ত করবার জন্যে, ঘুম পাড়াবার জন্যে, ফিসফিস করে উচ্চারণ করতে থাকে সে বিলকিসের নাম। তখন একটা অলৌকিক মায়ার মতো সৃষ্টি হয় তার চারদিকে। বিলকিস হয়তো এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। না, ঘুমিয়ে পড়বে কেন? তার পরীক্ষা; হয়ত রাত জেগে, বাম হাতে কপালের ভার নামিয়ে লেখাপড়া করছে। আলোর আভায় গড়ে উঠেছে। তার মুখ ঘরের অন্ধকারের ভেতর থেকে। সব ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষ, দালান, বাড়ি, রাস্তা, দেয়ালের ওপরে থাবা বিছিয়ে শুয়ে থাকা বেড়ালটা। বিলকিসের শরীর থেকে কুয়াশার মতো এক দীপ্তি আর কোন স্মরণাতীত কাল থেকে উত্থিত চেনা অগুরুর ঘ্রাণ যেন তার। ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে এসে আঘাত করছে।

কোনদিন বলা হয়নি বিলকিসকে। ভয়, সে যদি প্রত্যাখ্যান করে।

কিন্তু আজ, এখন, নিজেকে এত নিঃশঙ্ক আর প্রস্তুত মনে হচ্ছে। আবু উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় তার পায়ের শব্দ পেয়ে হাশেম ডাকল, শোন।

কাছে আসতেই শুধালো, ঠিকানা পেলি?

আবু লজ্জিত হয়। আরো আগেই জানানো উচিত ছিল তার। বলে, হ্যাঁ, পেয়েছি। এখুনি দেব, না, সকালে?

সকালেই দিস।

হাশেম যেন আলস্যে চোখ বুঁজলো।

.

অনেক রাত অবধি আবু অনেকগুলো কাগজ ছিড়বার পর বিলকিসের কাছে এই চিঠিটা লিখতে পারে—

চিঠি পেয়ে অবাক হবেন না, অপ্রত্যাশিত হলেই যে তা অসঙ্গত হবে এমন কথা নেই। কোনদিন কেউ আমাকে ডাকে নি। অমন একটা ডাকের জন্যে আমি বারবার মরে জন্ম নিতে পারি, সব তুচ্ছ করতে পারি। আপনাকে আমি এমন করে লিখতে পারছি, কারণ, অলক্ষ্যে আপনি আমার আপনতম হয়ে উঠেছেন। আমার যে কী আত্মমোহ ছিল! বাঁচতে চেয়েছিলাম আমি নিজেকে নিয়েই। একেকদিন একাকীত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। তখন মনে হতো, বুকের ভেতরে কে যেন কাঁদছে। তখন অস্থির হয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াতাম, ভিড়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজেকে ভোলাতাম—-যেন শিশুকে খেলনা দিয়ে ভোলাচ্ছি।

একদিন ঈশ্বর হাসলেন। আমার চোখের সমুখে তুলে ধরলেন একজনকে। তাকে আর ভুলতে পারলাম না। আমার মোহ ভাংগল, চূর্ণ হলো আমার অহংকার। চলমান পৃথিবী তার সমস্ত সবুজ আর রৌদ্র দিয়ে আমার দিকে কৌতুক আঙ্গুল তুলে, সমস্ত হাওয়া দূর দূরান্ত থেকে করতালি দিতে দিতে যেন বলে গেল একাকী থাকলে পারলে না।

এত কথা হলো, এতকাল ধরে ধরে এত বিনিময় করলাম, কিন্তু যে কথা বলব, তা আর বলা হলো না।

এত অনুভব করি, বলতে পারি না কেন? এত চাই, কাছে আসতে পারি না কেন?

একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমার বছর বারো বয়স, তখন একদিন জোর করে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের বুকের দুধ খেয়েছিলাম। যে দুধ খেয়ে আমার ছোটভাই বেঁচে আছে তার স্বাদ কেমন জানতে চয়েছিলাম।

ভাইটি মারা গেছে।

সেদিন দুধ মুখে দিয়ে থুতু করে দৌড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। সে দুধ ছিল ক্ষীণ, নোনা আর পানসে।

জীবন কি আবার এমনি করে আমাকে তাড়িয়ে দেবে? না, আপনাকে বিব্রত করব না কোন প্রশ্ন করে। তারে একটা টংকার পড়লে সুরটা কিছুক্ষণের মধ্যে অনন্তে যায় মিলিয়ে। কিন্তু রেশ থাকে অনেকক্ষণ।

আজ সারাটা দিন আমার এমনি।

আনন্দ-পুত্র হতে চেয়েছি পৃথিবীতে। চেয়েছি, আনন্দ যেন আমার জন্ম হয়, আনন্দ যেন আমার মৃত্যু হয়। আমার যে শূন্যতা আপনার স্পর্শে আনন্দ হয়ে উঠেছে, সে শূন্যতাকে বললাম—- সার্থক তোমার প্রতীক্ষা। আর সত্তাকে বললাম—-অন্য আর কিইবা বলতে পারতাম? তুমি অনন্তকালের জন্যে সঞ্চয় করে রাখো এই আনন্দের মহিমাকে।

সেই গল্পটা মনে করুন। একটা কক্ষ ভরে দিতে হাজার টাকার কার্পেট লাগে, আবার এক পয়সার মোম জ্বালিয়েও তা ভরে দেওয়া যায়। আপনার যতটুকু পেলাম তাই আমার আলো। শূন্য হাত বাড়িয়ে রইলাম আরো অনেক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। আমার ভয় কী? আমার যে বিশ্বাস রয়েছে আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। কাল আসবো।

ইতি, আবু।

.

পারিজাত বলল, ফিরে যাবেন না। আপা আপনাকে বসতে বলেছেন।

বিলকিসদের বসবার ঘরে এসে আবু গত তরশুর সেই সোফায় বসল। ঠিক আগের মতই। দুপা ক্রস করে, দুহাত ছড়িয়ে; যেন তার অবচেতন মনে এটা একটা মায়ায় দাঁড়িয়ে গেছে। আশ্চর্য, বিলকিস কী করে জানলো বকুলকে ভালবাসত হাশেম ভাই? হাশেমের জীবনের কতটুকু জানে এই মেয়েটা? সেদিন অমন করে হঠাৎ উঠে আসতে না হলে সে জিজ্ঞেস করতে পারত। আজো জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু কিন্তু আজ সকালে

বিলকিস তার চিঠি পেয়েছে। এখন যেন মনে হচ্ছে চিঠিটা না লিখলেই পারত। লিখলেও, না এলে হতো। বলতে কী, আবুর বুকের মধ্যে কাঁপন উঠেছে, বিলকিস যদি তাকে ফিরিয়ে দেয়! চিঠির কথা যতক্ষণ ভুলে থাকা যায়—- ভালো। বিলকিস যতক্ষণ এ ঘরে না আসছে ভালো।

অনেকক্ষণ পরে বিলকিস এলো। মুখে তার স্নিগ্ধ হাসি। আটপৌরে শাদা শাড়ি পরনে তার, চওড়া সবুজ পাড় নেয়ে উঠেছিল। সুবাস পাওয়া যাচ্ছে। একটা স্নিগ্ধ শ্রী ঘিরে রেখেছে তার কান্তি। আবু তাকে দেখে মধুর হাসলো। যেন দুজনের মধ্যে কিছুই হয়নি।

আবু বলল, হঠাৎ এসে পড়লাম।

কেন, চিঠিতে তো জানিয়েছিলেন।

কত সহজে চিঠির উল্লেখ করতে পারল বিলকিস। বিস্মিত হলো আবু। তার আশা হলো। কিন্তু অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না।

ওদিকে বিলকিসের মনটাও উদাস হয়ে উঠেছে থেকে থেকে। এ কথা তো বলা যায় না আবুকে। আজ যে মন্টির জন্মদিন। সকাল থেকে প্রস্তুত হয়েছিল যে মন, বাকবিতণ্ডা তুলে তাকে সে কিছুতেই নষ্ট করতে পারবে না।

চিঠিটা পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল বিলকিস। সে জানত, একদিন না একদিন এমন একটা কাণ্ড করে বসবে আবু। কিন্তু সেটা মন্টির জন্মদিনেই ঘটবে তা কে জানতো? ঠিক যেদিনটাতে সে একজনকে অনুভব করবে বলে জেগে উঠেছে সেই একই দিনে আরেকজনের কী ব্যাকুল আবির্ভাব। একেবারে ভোর সকালে সবার আগে ঘুম ভেঙ্গেছিল তার। গোসল করে এসে টেবিলে মাথা রেখে মন্টির জন্যে অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে কল্যাণ কামনা করেছে সে। ততক্ষণে ফুটে বেরিয়েছে দিনের আলো। সে আলোর বাধ ভাঙ্গা বন্যা এসে জাগিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। পৃথিবীর আর কারো কথা মনে ছিল না তার।

ঠিক তখন, নটার ডাকে, আবুর চিঠি এসে হাজির। পড়ে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি সে। এ সব কী লিখেছে লোকটা? আবার যখন পড়েছে তখন বুক কেঁপে উঠেছে। এ যে প্রার্থনা! এ যে আমন্ত্রণ।

হাশেমের ছোট ভাই আবু, এই কথাটা জানত না বিলকিস। তরশু দিন কথাটা জেনে অবধি আবুর মুখ বারবার ভেসে উঠেছিল তার চোখে। হাশেম, সেই ছেলেটা বকুল আপা যাকে ভালবেসেও কাছে করতে পারেনি। কেন পারেনি, জানতো না বিলকিস। আজ যেন মনে। হচ্ছে, তার নিজেকে দিয়ে মনে হচ্ছে, সেও পারবে না আবুকে কাছে করতে কিন্তু কেন পারবে না তা আবু কোনদিনও জানবে না।

শিউরে উঠেছিল বিলকিস।

না, তাকে স্পষ্ট হতে হবে, কঠিন হতে হবে। বকুল নিজেকে অস্পষ্টতার আড়ালে রেখে, বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রেখে যে অন্যায় করেছে, আবুর বেলায় তা কিছুতেই হতে দেবে না বিলকিস।

আবুর সামনে বসে এতক্ষণ চুপ করে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। বিলকিস তাই শুধালো, কেমন আছেন, বলুন।

ভালো। আপনি?

আমিও।

এই কথাগুলো বলতে চায়নি ওরা। তবু বলতে হচ্ছে। আবু হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলল, ভালো আছি বললে মিথ্যে বলা হয়।

কেন?

একা যে।

কেন একা থাকেন?

কেন? যদি জানতাম, কষ্ট থাকত না।

আবু খুব জেদ করে কথা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু তাকে নির্বাপিত হতে হল যখন। বিলকিস বলল, এ সব কথা আমি বুঝতে পারি না। যদি বুঝতে পারতাম তাহলে এমন করে সবাইকে ফিরে যেতে হতো না। তাছাড়া, আমি আর বুঝতে চাইও না।

আবুর তীব্র ইচ্ছে হলো চীৎকার করে বিলকিসকে জিজ্ঞেস করে, হাত গুটিয়ে রেখে কী আনন্দ হচ্ছে তার? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পাবে না। বদলে বিলকিসের কথাই শুনতে থাকে। তন্ময় হয়ে বিলকিস বলছে, আমার এখন পায়ে দড়ি। যাবার পথ নেই। দেবার উপায় নেই। বিশ্বাস করুন, কেউ ইচ্ছে করে ফিরিয়ে দেয় না। আপনি এখন তরুণ, কত বড় হতে হবে। আপনাকে, আপনি কেন এমন আবর্তে পড়ে ভুগে ভুগে মরবেন?

কক্ষনো না। কথাগুলো আসলে তিরস্কার। কিন্তু সেই তিরস্কারের জন্যেই আবুর ভালোবাসা যেন আরো প্রবল হয়ে উঠলো। মনে করেছিল, বিলকিস তাকে ফিরিয়ে দিলে প্রলয়কাণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। বাইরে রোদ আছে তেমনি। জানালা দিয়ে সকৌতুকে উঁকি দিচ্ছে ডালিম গাছ নিত্যকার মতো। বিদ্যুৎ ঘুরিয়ে চলেছে পাখা। তার হাত ঘড়িটাও চলছে। যতখানি কষ্ট হবে মনে হয়েছিল, তার এক কণাও নয়; এমন কি হৃদপিণ্ডটাও এতটুকু লাফিয়ে উঠল না। যেন প্রত্যাখ্যানের কথা তার আগে থেকেই জানা ছিল।

পায়ের পাতা দিয়ে মেঝের পরে নকশা কাটতে লাগল আবু। বলল, মরব কেন? জানেন, নিজেকে আমি সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমি কেন মরব?

বিলকিস বুঝতে পারল, এতো আবুর শক্তি নয়, শক্তির মুখোশে কান্না। বলল, এ কী অলুক্ষণে কথা আপনার! যাকে ভালবেসেছেন, তাকে সাক্ষী রেখে নিজে কষ্ট পাবার কোনো মানে হয়

আবু নিজেকে নিয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে দেখে বিলকিস চুপ করে থাকে।

অবশেষে বলে, পাওয়াটাই কি সব? যা আপন করে দেখেছেন, তার জন্য তুচ্ছ স্বার্থটাকে বিলোতে পারলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবেন যে।

হঠাৎ করে ফেটে পড়ে আবু। আর্তনাদের মতো বলে, তাহলে আমি কী করব

হুহু করে ওঠে বিলকিসের অন্তর। বকুল আর হাশেমের কথা মনে পড়ে। লুসিয়েন আর অগাস্টাস এসে সচকিত করে দেয়। পৃথিবী জুড়ে মানুষের একী বন্ধন! বকুল তো পারল না তাকে ফিরিয়ে দিয়ে সুখী হতে। ভেঙ্গে পড়েছে অগাস্টাস। আর মন্টি? মন্টি পাগলের মতো গলায় ক্ষুর দিতে চায়। ভয় দেখিয়ে লেখে, ভূমধ্যসাগরে ডুবে মরবে। মন্টিকে আজ চিঠি লেখা দরকার। আবুর চোখে চোখ রেখে বিলকিস বলে, আমি জানি না। আমার অত থাকলে দুনিয়া শুষ্টু লোককে পথ বাতলে দিতাম। নিজেই পথ খুঁজে মরতাম না। যদি আপনার জন্যে মায়াই না থাকত, আজ দেখাও করতাম না।

আবু পাথর হয়ে বসে থাকে। এত সহজে সব কিছু এমন নির্ধারিত হয়ে যাবে কে জানত? বিলকিস বলল, জীবনে আঘাত পেলে কী ভাঙ্গতে আছে? আঘাতই বা কেন? যা পেলেন না তা আপনাকে শক্তি দিক, নইলে শান্তি পাবো না।

তখন বিলকিসের জন্যে মমতা হয় আবুর। না, সে কষ্ট পাবে না, দুঃখ করবে না, ভেঙ্গে পড়বে না। তাকে বড় হতে হবে। ইচ্ছে করে, কথাটা বলে।

কিন্তু সংকোচ হয়। বলতে পারে, আমাকে একটু পানি দেবেন? বড় তেষ্টা পেয়েছে। পানি আনতে গেল বিলকিস। সারাটা ঘরে সে এখন একা। সারাটা জীবন যেন তাকে একা থাকতে হবে।

পানি দিয়ে বিলকিস বলল, কী সব আমরা বকছি বলুন তো! আসুন, তার চেয়ে গল্প করি। তার কণ্ঠের সঙ্গীত কী অন্তরঙ্গ সুন্দর। আবুর মনটা এক নিমেষে পাখির মতো হালকা হয়ে গেল। সে বলল, একটা কথা, কিছু মনে করবেন না তো?

না, না।

আবু মহা উৎসাহে শুরু করল, অনেকদিন ধরে ভাবতাম আপনার কথা। আপনার গল্প বলুন না? আমি শুনবো।

বিলকিস আশ্চর্য হয়। একটু লজ্জিতও হয় যেন। বলে, আমার আবার গল্প কী?

আবু যেন বিরাট একটা আলোচনার সূত্র পেয়ে গেছে। বলে, সব মানুষেরই গল্প আছে, আপনি জানেন না বুঝি? মানুষ কত কীভাবে, কত হাজার হাজার দিন পার হয়ে আসে— - এর চেয়ে ভালো গল্প কেউ লেখে নি।

তখন বিলকিস খুব খুশি হয়ে উঠল। তার ভালো লাগল আবুর মুখোশহীন কথা বলার ঢং। বলল, আমার কথা কেন শুনতে চান?

আপনাকে খুব কাছের মানুষ মনে হয় আমার। তাই শুনতে চাই।

আমি বললে আপনাকেও বলতে হবে।

আবু ইতস্তত করে একটু।

কী হলো?

বেশ বলবো।

বিলকিস হঠাৎ দেখে, আবু ম্লান হয়ে গেছে। দেখে ভয় করে তার। জিগ্যেস করে, কী ভাবছেন?

কিছু না।

বিলকিস তখন হাসল। বলল, আমাদের দুজনের অবস্থা একই রকম। বেশ তো, এত তাড়াহুড়ো কী? অন্য কোনদিন শোনা যাবে।

আচ্ছা।

আবু বুঝতে পারে না, তার ভেতরটা তবু এত অস্থির আর শূন্য লাগছে কেন! বিলকিস হঠাৎ জিগ্যেস করে, আপনার হাশেম ভাই কেমন আছেন?

চমকে উঠল আবু। মনে মনে হাশেম ভাইয়ের কথাই ভাবছিল সে, অথচ নিজেই ঠাহর করতে পারছিল না। বিলকিসের কথা শুনে কুয়াশা ছিঁড়ে গেল।

সে বলল, ভালো। ঠিকানাটা উনিই চেয়েছিলেন। আমি কিসসু বুঝতে পারছি না কেন?

ঠিক তখন ভেতর থেকে ডাক পড়ল বিলকিসের। বিলকিস যদিও আবুকে বলল, আপনি একটু বসুন; আবু উঠে দাঁড়াল।

না, থাক। অনেকক্ষণ কষ্ট দিয়েছি আপনাকে।

যাবেন? আচ্ছা।

বিলকিসের মুখ ছায়া হয়ে এলো।

আসুন। মাঝে মাঝে খবর নেবেন কেমন থাকি না থাকি।

আচ্ছা।

আবু বেরিয়ে আসে। হঠাৎ করে নিজেকে খালি খালি মনে হয়। আর যেন তার কোন কাজ নেই।

যেন তার জন্ম হয়নি, তার মৃত্যু হবে না; জীবন ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে কিন্তু তাকে স্পর্শ করবে না আর।

৮. বিলকিস ভেতরে এলে

বিলকিস ভেতরে এলে তার মা বললেন, তোর আক্কেলটা কী বলতো?

বিলকিসের মনটা যেন হোঁচট খায়। নিজেকেই অবাক করে দিয়ে সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কেন, কী হয়েছে?

কী আবার? টুকু আর টুবলুকে নিয়ে বকুলের কাছে যাবি বলেছিলি। সেজেগুঁজে কাঁদছে। গল্পটা কমালে কী হয়?

বিলকিসের চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করে বলে, তার আমি কী করব? আমি পারব না।

দুপদাপ করে নিজের ঘরে আসে বিলকিস। কোথায় যেন কী হচ্ছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এ বই সে বই ওলটাতে থাকে, চেয়ার বদলায়, জানালার পর্দাগুলো মুক্ত করে দেয় কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি নেই তার।

টুকু আর টুবলু হাত পা ছড়িয়ে কাঁদছে। মায়ের কাছে আজ তারা ফিরে যাবে বলছিল। বেরিয়ে এসে তাদের ভীষণ আদর করতে থাকে সে। তারপর কান্না থামলে নিজের ঘরে এসে চিঠি লিখতে বসে। লেখে—-

মন্টি, আজ তোমার জন্মদিন।

সকালে মনে হলো, শিয়রে দাঁড়িয়ে তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে।

আচ্ছা, তোমার যখন ঘুম ভাঙ্গল আজ, কার কথা মনে পড়েছিল? আমার গা ছুঁয়ে বল।

মন্টি, আমার একী হয়েছে? নিজেকে আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না। রাগ হচ্ছে, অভিমান হচ্ছে, চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। আমি ভেঙ্গে পড়বার আগেই কী তুমি আসবে? নাকি এসে আমার মৃতদেহ দেখবে? তোমার অমন করে বাইরে না থাকলেই নয়? আজ রাতটা ইচ্ছে করছে তোমাকে যেন স্বপ্নে দেখি।

চিঠিটা শেষ হলে সুন্দর করে ঠিকানা লিখল। তারপর বন্ধ করবার আগে সমস্ত কাগজে মুখ বুলে বিলকিস; যেন তার সমস্ত অনুভব, সমস্ত কথা, সম্পূর্ণ মনটা যা লেখা গেল না, এমনি করে রেখে দিল চিঠিটায়।

টুকু আর টুবলুকে নিয়ে বেরুলো সে। ওদের দিয়ে আসার পথে নিজে ডাকবাক্সে ফেলে আসবে চিঠিখানা। কিছু চিঠি থাকে, নিজের হাতে না পাঠালে মনের মধ্যে সারাক্ষণ কেমন কেমন করতে থাকে।

.

বেলা শেষে মেঘের মতো বীথি ঘুমিয়ে ছিল। হাশেম তার পাশে বসে গালে হাত রাখল। নিজের গায়েই এত জ্বর তবু বীথির উত্তাপটা ধরা পড়ছে। কাল রাত থেকে কিছু খায়নি বীথি। কদিন থেকে যে দুর্বলতা যাচ্ছিল আজ তা জ্বর হয়ে দেখা দিয়েছে।

তোকে দেখতে এসেছি রে।

বীথি শুনতে পেল না হয়ত। নাকি খুব কষ্ট হচ্ছে? তার আঙ্গুলগুলো তুলে নিল হাশেম। ডাকল, বীথি, আমি।

হাশেমের গলা কাঁপছে থরথর করে। যেন ঝড়ের মধ্যে দৌড়ে এসে একটা মানুষ আর কথা বলতে পারছে না।

নিজের ওপর নিজে শোধ নিতে নিতে ক্লান্ত অসুস্থ হয়ে গেছে বীথি। সেই ক্লান্তির ভেতর থেকে যেন মনে হলো ডাক এসেছে। তখন ফিসফিস করে স্বপ্নের ভেতরে, স্বপ্ন থেকে জাগরণের দিকে যেতে যেতে বীথি উচ্চারণ করল, আবু ভাই এসেছ!

পাশেই ছিলেন আমেনা আর মরিয়ম। এ নাম শুনে তাঁরা দুজনেই বিব্রত হয়ে গেলেন। চোখ ফিরিয়ে নিলেন বীথির দিক থেকে। এবার দুজনে দুজনের দিকে চোখ পড়তেই অপ্রস্তুত মরিয়ম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাশেম আরো শক্ত করে ধরে রাখে বীথির আঙ্গুল। চোখ মেলে তাকে দেখে সংকুচিত হয়ে যায় বীথি। এ কী করছিল সে? বুকের ভেতর মোচড় ওঠে। হাশেমের হাতটা ধরে রাখে; উৎসুক চোখে সারা ঘর অনুসন্ধান করে কার জন্যে। পরে নিভে যায়।

তখন আমেনাও বেরিয়ে আসেন। তাকে দেখে মরিয়ম বলেন, হাশেমের কী আক্কেল আছে বুবু? এত জ্বর নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছে কাউকে কিছু না বলে।

মরিয়ম যেন জোর করে চিন্তা থেকে বীথিকে দূরে ঠেলে রাখতে চান। তাই হাশেমকে নিয়েই কথা বলতে থাকেন বিরতিহীন। যেন উপসর্গটা এতেই কমে যাবে। বলে চলেন, ঘরে গিয়ে দেখলাম, হাশেম নেই। মনে করলাম, আছে কোথাও। তাও এলো না। একা বাসায় আমি। আমাকে ও শুধু জ্বালাতেই এসেছে। কান্না ফুটে বেরুতে থাকে মরিয়মের কণ্ঠে। বিকেলে ছেলেকে না পেয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে এসেছিলেন এ বাসায়। মনে করেছিলেন, বীথির মায়ায় হাশেম বুঝি এখানে এসেছে। কিন্তু এখানেও ছিল না।

আমেনা তখন যেতে দেন নি মরিয়মকে। বলেছেন, ও এখানেই আসবে দেখিস। সত্যি সত্যি একটু আগে এখানে এসেছে হাশেম। আমেনা বললেন, তুই একটুতেই ঘাবড়াস মমো। বললাম, ছেলে যাবে কোথায়? বীথি অসুখে, দেখলি তো এখানেই এলো?

না বুবু, আমার বুকের ভেতর কেমন করছে।

আমেনা তখন মরিয়মকে মোড়া টেনে বসতে দেন। নিজেও সামনে বসেন। বলেন, আচ্ছা মমো, একটা কথা সত্যি করে বলতো।

মরিয়ম উদ্বিগ্ন হয়ে তাকান তার দিকে।

—-বীথিকে তোর বউ বলে পছন্দ হয় না? আমি বোধ হয় ওকে এ বাসায় এনে ভুলই করলাম।

কার কথা বলছ?

আহা, আবুর। তোর কী চোখ নেই, মমো? আবুর জন্যে ওর পরান পড়ে আছে দেখতে পাস না?

ওদিকে ঘরের মধ্যে হাশেম আর বীথি। বীথির আঙ্গুলগুলো তখনো তার হাতের মধ্যে। বীথিকে কী সুন্দর লাগছে তার। সে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে তোর? ডেকে আনবো ওকে?

বীথি মাথা নাড়ে—- না, না।

আজ হাশেমেরও অসীম কষ্ট। তাকে মাথা নাড়তে দেখে ভীষণ চটে যায়। তার হাত ফেলে দিয়ে বলে, তুই এত বোকা কেন রে? তুইও কি আমাকে শান্তিতে মরতে দিবিনে, বীথি? উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে অশান্ত পায়চারি করতে থাকে হাশেম। জানালাটা খুলে দেয় ভাল করে। রক্তিম আকাশ দেখা যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে বীথির সমুখে স্থির হয়ে দাঁড়ায় সে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এড়াবার জন্যে বীথি প্রশ্ন করে, অসুখ নিয়ে এলে কেন?

হাশেম আবার তার পাশে বসে পড়ে। বলে, অসুখ কইরে? আমি যে ভাল হয়ে গেছি। দ্যাখ আমার গা ছুঁয়ে। দ্যাখ তুই।

বীথির হাতটা তুলে নিজের কপালে রাখে।

—-কী দেখলি?

অসম্ভব জ্বর হাশেমের। বীথি ম্লান হাসল উত্তরে! তখন হাশেম ঝটকা মেরে তার হাতটা ফেলে দেয়। বলে, ও। তুইও বিশ্বাস করলি না?

আবার উঠে পায়চারি করতে থাকে। যেন মাঝে মাঝে কিসের টানে বাধা পড়ে যাচ্ছে, তাই বসতে হচ্ছে, নইলে এমনি করে হেঁটে হেঁটেই সে জীবনপাত করত।

ঘরের ভেতরে বাইরের রাঙ্গা আলো এসে পড়েছে। সেই অপূর্ব আলোর ভেতরে তন্ময় হয়ে চলতে চলতে ঠিক প্রথম দিনের মতো সমুখের শূন্যতাকে উদ্দেশ করে হাশেম বলতে থাকে, জানিস বীথি, পৃথিবী জুড়ে সবাই কষ্ট পাচ্ছে। মনে করলাম, বাইরে দাঁড়িয়ে সব মোহ ফেলে দিয়ে, সবার শান্তি দেখে বুক জুড়োবো। শুনতে পাচ্ছিস বীথি, আমি কী বোকা। আমার স্পর্ধা দেখেছিস তুই! —-দূর তুই কিসসু বুঝতে পারছিস না। তোর কেন অসুখ হলো রে? মরতে চাস বুঝি? বড্ড কষ্ট বীথি তুই, মরিস না।

বিছানায় উঠে বসতে চায় বীথি। মৃত্যুতে এত কষ্ট, তবে তার সান্ত্বনা কোথায়? আরো কী কষ্ট হয় মৃত্যুতে? হাশেম এগিয়ে এসে দ্রুত দুহাতে তাকে ভর দেয়, আস্তে আস্তে উঠিয়ে আনে বালিশ থেকে বিছানা থেকে। বলে, আমার সঙ্গে হাঁটবি? তাহলে আমাকে ভাল করে ধর। দ্যাখ কী সুন্দর সন্ধ্যে হচ্ছে।

বীথি তার হাত ধরে বলে, তোমার গা কাঁপছে হাশেম ভাই।

আর্তনাদের মতো শোনায় হাশেমের উত্তরটা তাই নাকি রে? বেশ, আমাকে ছেড়ে দে।

কিন্তু বীথি তবু ওর হাত ধরে রাখে। মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার আজ কী হয়েছে? নিজের অসুস্থতার কথা মনেও থাকে না বীথির। আবছা করে বুঝতে পারে এই মানুষটার মনের মধ্যে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি উঠেছে, যা আজ একেবারেই নতুন। চোখ বিস্ময়ে আকুল হয়ে ঠে। বীথি হাশেমের হাত ধরে নাড়া দেয়। তখন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাশেম বলে, তোকে দেখতে এলাম, আর তুই কী না আমাকে নিয়েই পড়লি। আমি জানি না বুঝি তোর মরতে সাধ হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে হাশেম জানালার কাছে চলে যায়।

মানুষের মনটা, জানিস বীথি, বিরাট এক বনের মতো। কুল নেই, দিক নেই, মাথার ওপরে আলো নেই—- নিথর এক বন। আর তোর বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ওটা হচ্ছে বাঘ। সোনার মতো, রক্তের মতো সেই বাঘটা সেখানে রাজা হয়ে আছে। মানুষ তাকে আফিম

খাইয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। থাকবে কেন? ও যে রাজা। একদিন শিকল ছিঁড়ে অরণ্যে গিয়ে তোলপাড় করে তুলবে না?

হাশেমের চোখ কী অদ্ভুত রকমের শূন্য। ভূতগ্রস্তের মতো লাগছে তাকে। বীথির দেখে ভয় করতে থাকে। নিজের নিঃসঙ্গতা যেন আরো দশ গুণ হয়ে উঠতে চায়। হাশেম বলে চলে, হারে হা। আমি কি মিথ্যে বলছি? নইলে, সবাইকে ফাঁকি পর ফকির দিয়ে জীবনটাকে ভরিয়ে তুলতে দেখে এত খ্যাপা হয়ে গেলাম কেন?—-দ্যাখ দিকি, তোর অসুখ আর আমি বকবক করে যাচ্ছি। আয় তোর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দি। আয়।

বীথিকে কাছে আসতে হয় না। হাশেমই এগিয়ে তার কপালে হাত রাখে। আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেয়। বীথির যেন মনে হয়, হাশেম এমনি করে নিজেকেই সান্তনা দিচ্ছে। হাশেম বালে, ভয় পাসনে বীথি। ভয় করতে নেই। জীবন কখনো ভয়কে মেনে নেয় না। কী তুই! এত কষ্ট শুধু শুধু পাস।

হাশেম ওর কপাল ছেড়ে হাতটা তুলে নেয়। আলতো করে অপ্রত্যাশিত একটা চুমো দেয় হাতে। তারপর কিছু না বলে চলে যায়। যেন, হঠাৎ কোথাও তারপর কিছু না বলে চলে যায়। তার ছিঁড়ে গেছে। এক মুহূর্তে তাই সব স্তব্ধ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গেল বাইরের নেমে আসা সন্ধ্যের মতো। ঘর থেকে হনহন করে হাশেমকে বেরুতে দেখে আমেনা আর মরিয়ম দুজনেই অবাক হয়ে যান। হাশেম ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যায় মাতাল নৌকোর মতো। কিন্তু কী ভেবে আবার ফিরে আসে। এসে বলে, বীথিকে দেখো। আমি বাসায় যাই।

.

আবু বাসায় ফিরে দেখল একটাও বাতি জ্বলেনি। কেবল রান্না ঘরের খোল। দুয়ার দিয়ে নিম গাছের কোল অবধি এক ফালি আলো পড়েছে। সারাবাড়িতে কেউ নেই। যেন এমন একটা পরিবেশ তার জন্যে দরকার ছিল। বিলকিসের ওখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে, কী করেছে, কী ভেবেছে, কিছুই মনে পড়ছে না। মাথার ভেতর যন্ত্রণাও নেই, স্বস্তিও নেই। রাজ্যের অন্ধকারে তলিয়ে থাকা বাসায় ঢুকে তার মনে হল—- হ্যাঁ, এইতো আমার বাসা। অন্ধকার বড় ভালো লাগল তার। স্নায়ুর ভেতরে উদ্বেগ ছমছম করছে, কিন্তু তবু ভালো। চাকরটার কাছে শুনল, মা বড় চাচিদের ওখানে। শুধালো, হাশেম ভাই?

ওপরে আছেন।

তখন আবু উঠে এল ওপরে। এই মুহূর্তে বড় আপন মনে হচ্ছে তার মায়ের পেটের এই ভাইটাকে।

হাশেমের ঘরে বাতি জ্বেলে দিয়ে যায়নি কেউ। ভারী রাগ হলো তার চাকরটার ওপর। ভাইয়ের নাম ধরে ডাকল একবার। কোনো উত্তব এলো না। নিমের ডালে হঠাৎ দোলন। লাগল বাতাসে, যেন ওটাই তার উত্তর। বাতি জ্বালল আবু। এতক্ষণ অন্ধকারের পর

আলোটা চোখ ধাধিয়ে দিয়ে গেল। চোখ সয়ে এলে দেখল, হাশেমের বিছানা শূন্য। বারান্দাটাও তেমনি শূন্য, নিঃশব্দ।

তখন বাতি নিবিয়ে নিজের ঘরে এসে বাতি জ্বালল। দেখল, তার টেবিলের ওপর একটা চিঠি চাপা দেয়া। কাছে আসতে হলো না। দূর থেকেই লেখা দেখে বুঝল, কার চিঠি।

চলে যাচ্ছি। না এলেই পারতাম। আমি তো মরেই গিয়েছিলাম, আবার মরতে এসেছিলাম কেন? বকুলের সঙ্গে দেখা করে আজ আমার নতুন চোখ খুলেছে। দেখলাম, একজনের মৃত্যু আরেকজনের কাছে কত অর্থহীন। তাই আবার আমি বিরাট পৃথিবীর কাছে ফিরে যাচ্ছি।

তুই অন্ধ আবু। তুই অন্ধ, বীথি তোকে ডাকছে, তুই শুনছে পাচ্ছিস না? এমন করে সব অপচয় করবি?

মনের অসুখটা বীথির শরীরে গিয়ে পৌঁছেছে। আমি তো জানি, কী হবে এরপর। আমার অভিশাপই কুড়োবি, না হাত বাড়িয়ে ওকে নিবি? ও তোকে এমন করে ডাকছে আজ, তুই শুনতে পাচ্ছিস না? তুই ছিলি কোথায়? আমার ভালোবাসা রইল।

ইতি, হাশেম।

চিঠি পড়ে প্রথমে আত্মায় কোন সাড়াই জাগে না। চিঠিটাকে ভাঁজ করে রেখে দেয় শূন্য ফুলদানির ভেতরে। এ ফুলদানিটা বীথি রোজ সাজিয়ে রাখত। বাতি নিবিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল আবু।

তখন ওই জানালার ওপারে অন্ধকার থেকে, অন্ধকারের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে ভেসে উঠল হাশেমের মুখ। আর বকুল। বকুলের মুখটা কবরের মতো মনে হলো তার। হাশেম নেই, ছিলও না কোনদিন। চলে গেছে, এটা যেন কত সুন্দর একটা শেষ। বিলকিস যা বলেছে, তাও কত মহিমা জড়ানো শেষ। বীথিকে নিয়ে গেছে, বীথি জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে—- এটাও একটা শেষ।

আমি কিছু ভাবতে পারছি না—- আরো একটি শেষ, শেষের পর। আর এই অতল অন্ধকার সব কিছু কোলে করে রেখেছে তার অপরূপ অবোধ মমতা দিয়ে। নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল আবু। যেন তার মৃত্যু হচ্ছে। প্রেমিক, কুটিল, মহৎ, নিষ্ঠুর মৃত্যু। যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। মৃত্যু যে এত স্বস্তি, এত সুন্দর, তা কে জানত? স্পষ্ট করে নিজের মৃত্যুকে দেখতে পায় আবু। এত স্পষ্ট, এত মায়া জড়ানো যে মনে হয় রাজার মুকুট মাথায় দিয়ে আছে সে। আহ, দীর্ঘ হোক মৃত্যুর এই মুহূর্ত। আসুক ধীরে ধীরে, নিয়ে যাক মেঘের ভেতর দিয়ে দূরে, আরো দূরে। চোখ বুজে তাকে কোথায় কোন রাজ্যে কে নিয়ে যাবে বলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খুলে অপেক্ষা করতে থাকে আবু। চোখ ভরে সে দেখতে পায় তার ঘর আলো হয়ে উঠেছে, যে আলো দেখা যায় না, অনুভব করতে হয়। আর এক সুদূর সুরেলা কণ্ঠ ভরে তুলেছে সারাটা পৃথিবী, পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশ, আর আকাশের নিচে মায়ার মতো ঘরের পর ঘর, বাঁশবন, প্রাঙ্গণ, ঐ রাস্তা। স্পষ্ট সে শুনতে পায়, ছোটবেলায়

যে হাফেজের কাছে কোরান পড়ত, তিনি কবেকার রাত দুপুরের মতো অন্তরের শিখা জ্বালিয়ে আবৃত্তি করছেন পাক কোরান। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। অনুভব করা যাচ্ছে, তিনি তার শিয়রে এসে হাঁটু মুড়ে বসেছেন। সারাটা ঘর ভরে উঠেছে গাঢ় লোবানের ঘ্রাণে। আর তার বিছানাটা হয়ে উঠেছে। প্রাচীন, আবলুস কালো একটা খাট—- যার পা বাঘের থাবার মতো। শাদা বালিশে মাথা রেখে, শাদা চাঁদর বুক অবধি টেনে সে ডুবে আছে। আলো অন্ধকারে মৃত্যুর বাড়ানো হাত তুলে নিচ্ছে তাকে। পাশে দাঁড়িয়ে বাবা, মা, মাহবুব ভাই, হাশেম ভাই। সবাই তাকে দেখছেন, ঈর্ষা করছেন। আজ যে আমার মৃত্যু হচ্ছে। মা, তুমি ছোটবেলায় গল্প বলতে?—-মানুষ মরে গেলে তাকে শাদা ঘোড়ায় পিঠে করে আকাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়?

.

আবু নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। ঐতো বাইরে শোনা যাচ্ছে কোন অতীত থেকে ছেলেদের হুল্লোড়। ঐতো সেই পাথর বাঁধানো রাস্তাটা, যে রাস্তার দুদিকে কেবল গাছ আর গাছ গাছের চূড়া ছড়ানো নীল আকাশে যে গাছের ছায়া ধরে হেঁটে অভিমান করে অনেক দূর চলে যাওয়া যেত।

বিছানায় শুয়ে থেকে, মৃত্যুর হাতের নিচে, আবু দেখে সেই রাস্তায় রোদ পড়েছে। রোদটা তাকে সোনা হয়ে ডাকছে। ছেলেরা উতল হয়ে উঠেছে। দূরে, কতদূরে, সেই নদীটা খলখল করে তাকে ডাকছে। আবু বিছানা থেকে স্বপ্নের মতো উঠে দাঁড়ায়। সম্মোহিতের মতো বারান্দা পার হয়ে নামতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে। বাগানের ভেতরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট

শুনতে পায় ছেলেদের কোলাহল। রোদের ভেতরে বেড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। পা বাড়ায়। কিন্তু সামনে যে নদী। নদীর কী নাম ছিল যেন? একেক দিন বাবার হাত ধরে এই নদীটার পাড়ে ঘুম থেকে উঠে আসা ভোরের মতো আজো যেন ডাক দিচ্ছে। যোজন কুয়াশার মতো বিছিয়ে আছে তার পাড়, তার স্রোত; তার। স্পন্দন যেন বুকের স্পন্দন। বেলি গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে অন্ধের মতো আবু ব্যাকুল দুহাত বাড়িয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে।

খুঁজে পায় না। খুব কষ্ট হয়। অনেকদিন আগে মাহবুবকে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছিল আবু। পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছিল তার। তারপর রাতে ভীষণ জ্বর এসেছিল। সেই কবে, সেদিন যেন ঠিক এমনি কষ্ট হচ্ছিল আবুর। বাবা তো তাকে কিছু বলেননি।

তবু রাতে ঘুমোতে গিয়ে, তার ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাবার বুকে। বলেছিল, ও মরবে জানলে আমি কক্ষনো ধাক্কা দিতাম না। সত্যি বলছি, সত্যি বলছি। সেদিন বাবা তার পিঠে হাত বুলিয়ে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, মরবে না রে। তুই দৌড়ে গিয়ে ওকে চুমো দিয়ে আয়। ভালো হয়ে যাবে।

আবু পাগলের মতো আবার হাত বাড়ায়। উন্মত্তের মতো সারাটা বাগানে খুঁজে ফেরে। নদীটা কুয়াশা। সেই কুয়াশার অন্তঃস্থলে অভিমানী দীপ্তির মতো কার অনুভব যেন লুকিয়ে থাকে। সহস্র অশ্রুতে বিকৃত কণ্ঠে হাহাকার করা ডাক দিয়ে উঠে আবু, বীথি, বীথি-ই, বীথিরে। নামহীন কবেকার দেখা সেই নদীটার তীর থেকে তীরে ভোরের আলো

কুয়াশার ভেতরে নৌকো থেকে নৌকোর দিকে ডাকের মতো ধ্বনিটা আছড়ে পড়ে আবুর চারদিকে। কুয়াশা যেন থরথর করে ফেটে ফেটে পড়তে চায়।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

১৯৬০